আজব চিড়িয়াখানা

শ্রীপান্থ





(৪)

আজব চিড়িয়াখানা

আজব চিড়িয়াখানা



শ্রীপান্থ

Ajab Chidiyakhana
a book on Supernatural
Creatures for children by
Sripantha

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রকাশক
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

নাম জানা না-জানা
শিল্পীদের ছবি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ ও শিল্প রূপায়ণ
অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রক
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ২৫ টাকা





সুর্মা
সুখ
সায়েরি
তিন পরিকে

কল্পলোকের প্রাণীরা

অনেক অনেকদিন আগের কথা। আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে তখন একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। রাজ্যের নাম সিহলন। সুখী সমৃদ্ধ রাজ্য। হঠাৎ তাকে ঘিরে অশান্তির কালো মেঘ। নগর প্রাচীরের বাইরে উপস্থিত হয়েছে ভয়াবহ এক দানব। প্রতিদিন তার উদর-পূর্তির জন্য ভেড়া চাই। রাশি রাশি ভেড়া চলে গেল তার পেটে। ড্রাগন তবু খুশি নয়, ভেড়ার সঙ্গে তার মানুষও চাই। প্রতিদিন নিদেন-পক্ষে একটি করে কুমারী মেয়ে চাই। রাজা প্রমাদ গণলেন। তিনি হুকুম দিলেন কুমারীরা নিজেরাই লটারি করে স্থির করুক কে যাবে ড্রাগনের কাছে। এমনই ভাগ্য, একদিন লটারিতে নাম উঠল স্বয়ং রাজকন্যার। রাজার মাথায় হাত। রাজকন্যার নাম সাব্রা। রাজা প্রজাদের কাছে সাব্রার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। বললেন, আমার আদরের কন্যাটিকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিও না তোমরা। কিন্তু প্রজারা নাছোড়বান্দা। তাদের কথা, এ আইন তো তৈরি করেছেন রাজা নিজেই। সুতরাং তার অন্যথা হতে পারে না।

দুঃখী রাজা দেখলেন তাঁর আদরের কন্যা সাব্রা ফটক পেরিয়ে চলেছে ড্রাগনের দিকে। তিনি দুহাতে চোখ ঢাকলেন। আশ্চর্য, ঠিক তখনই সেখানে ঘোড়ার পিঠে হাজির হলেন বর্ম পরা এক যোদ্ধা। ইনি লিড্ডার জর্জ। তিনি যাচ্ছিলেন খ্রিস্টান দাসদের প্রাণ ভিক্ষা করতে রোমান সম্রাট দায়োক্লিসিয়ানের কাছে। হাতে

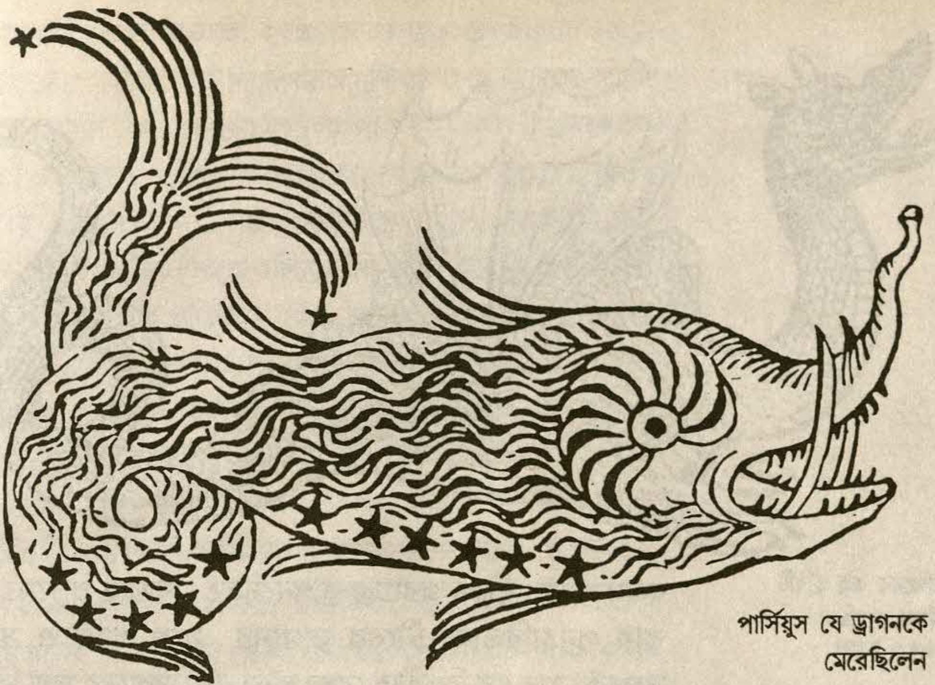
তরোয়ালের বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে লিড্ডার জর্জ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে ড্রাগনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শুরু হল লড়াই। সে লড়াইয়ের পরিণতি? ভয়াবহ ড্রাগনের মৃত্যু। রাজকুমারীর মুক্তি। সিলেনের লোকেরা বীরের সম্বর্ধনা জানালে জর্জকে। তারা যখন শুনল জর্জ একজন খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের করুণাতেই এমন শক্তিমান, তখন তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল। আর, সেই থেকে খ্রিস্টীয় উপকথায় ঠাঁই পেল সেন্ট জর্জ এবং ড্রাগনের উপাখ্যান।

গ্রিক পুরাণে রয়েছে একই ধরনের কাহিনী। এক সামুদ্রিক ড্রাগনের হাত থেকে সুন্দরী অ্যাণ্ডোমিডাকে উদ্ধার করেছিলেন পার্সিয়ুস। ড্রাগনের কল্পনা রয়েছে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং মিশরের উপকথাতেও। পণ্ডিতেরা বলেন যিলেন আজকের লিবিয়া। খ্রিস্ট জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরীয়রা ছিল মেসোপটেমিয়ার বাসিন্দা, মেসোপটেমিয়া আজকের ইরাক। সেখানে যে ড্রাগন তার নাম জু। সে সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা এন লিনের কাছ থেকে বিশ্বের কল্যাণের জন্য রচিত আইনসমূহ চুরি করেছিল। ক্রুদ্ধ এন লিন সূর্যের দেবতা নিলউর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অপরাধী ড্রাগনকে হত্যা করতে। ব্যাবিলনের ড্রাগন বিশৃঙ্খলার মূর্তিমান দেবী তিয়ামেত-এর প্রতীক। এ দেবীর মাথায় আগুনের মুকুট। তিনি ড্রাগন নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন শুভ, শৃঙ্খলা আর ন্যায়ের প্রতিভূ দেবগণকে। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা মার্ডুক হত্যা করেছিলেন সেই ভয়াবহ দেবীকে। প্রাচীন মিশরের উপকথাও একই ধরনের উপাখ্যান।

সেন্ট জর্জ ও ড্রাগনের যুদ্ধ



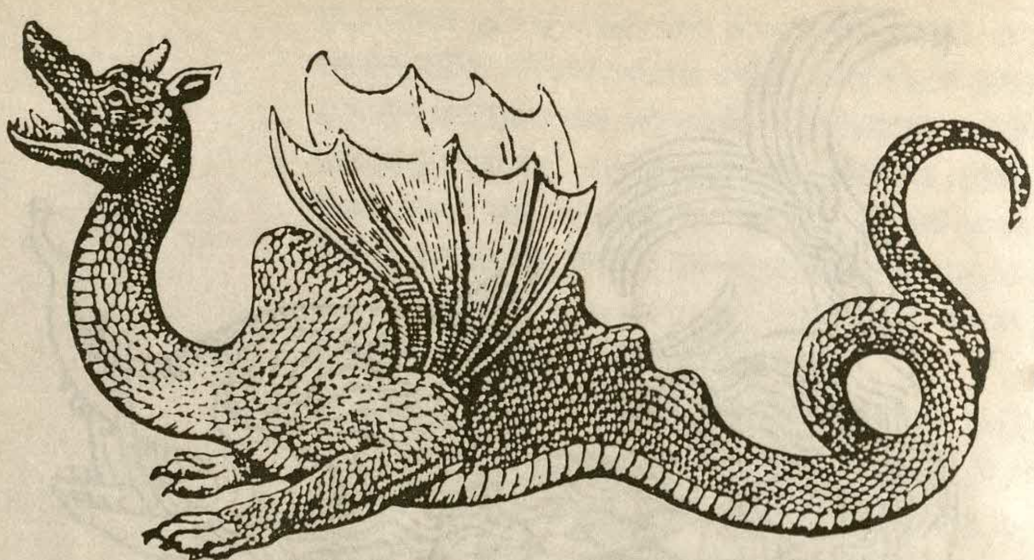
ড্রাগন কোথাও সরীসৃপ। কোথাওবা সিংহ, কুমির, হাতি, জলহস্তী ইত্যাদি মিলিয়ে এক কিম্ভূত প্রাণী। চীনের ড্রাগন আশওয়ালা। ওদের পুরাণ বলে প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ড্রাগন। তার মাথা উটের মতো, শিং হরিণের মতো, চোখ খরগোশের মতো, কান ষাঁড়ের মতো, গলা সাপের মতো, পেট ব্যাঙের মতো, আঁশ মাছের মতো, নখ ঈগলের মতো, পা বাঘের মতো, চীনের ড্রাগন আতঙ্ক ছড়ায় না। চীনের ড্রাগন শান্ত, নম্র, ভদ্র



পার্সিয়ুস যে ড্রাগনকে মেরেছিলেন

উপকারী। তারা সুখ এবং প্রাচুর্যের প্রতীক। তারা থাকে নদীতে, হ্রদে। এমনকি কখনও কখনও জাদুবলে নিজেদের ছোট্ট করে জলবিন্দুতে পর্যন্ত। এই ড্রাগনের নিঃশ্বাস কখনও কখনও আকাশে মেঘ গড়ে তোলে, কখনওবা আগুন সৃষ্টি করে, কখনওবা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে মাটিতে।

সেণ্ট জর্জের কাহিনী যদি আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লড়াই, তবে সুমের, ব্যাবিলন কিংবা মিশরের ড্রাগনের কাহিনীতেও তা-ই। শুভ আর অশুভের মধ্যে লড়াই। সেণ্ট জর্জ আদিম ধর্মের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় ধর্মের আলোক দেন। অন্যত্র মনস্তাত্ত্বিকেরা এই ড্রাগনের উপকথার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মানুষের মনের গভীরের নিহিত আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে লোভ, হিংসা, লালসা, নানা অশুভ চিন্তা। আবার প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে শুভ, মঙ্গল, শান্তি ও কল্যাণের ধ্যান। ড্রাগন হত্যা সেই অশুভের ওপর শুভের বিজয় কাহিনী মাত্র। কেউ কেউ ড্রাগনের কল্পনায়, প্রকৃতির রূপান্তরকেও খুঁজে পেয়েছেন। শীত



ড্রাগনের এই ছবিটি আঁকা হয়েছিল ১৬৪০ সালে

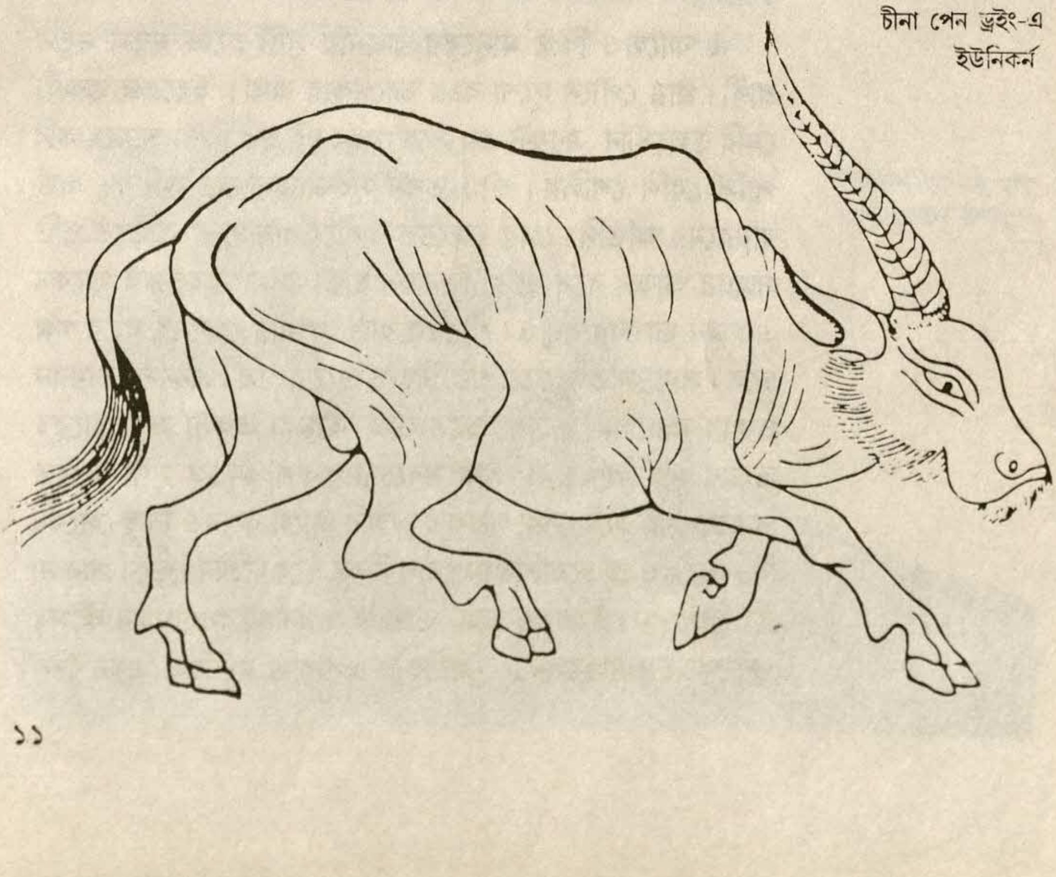
বনাম বসন্ত। শীতে জরাগ্রস্ত ড্রাগন নিহত। বসন্তে প্রাচুর্যের মধ্যে তার পুনরাবির্ভাব। চীনের ড্রাগনের সঙ্গে শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্পর্ক। অতএব বিপরীত কোন ঘটনা নয়। ড্রাগনের জন্ম কি তবে মানুষের মনের গহনে? তার কি বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই? প্রকৃতির নানা শক্তিকে ড্রাগন হিসাবে হয়তো কল্পনা করেছে মানুষ। বিশেষ করে সেই সব শক্তিকে যাদের বশ মানানো শক্ত। তবে এমনও হতে পারে এই ড্রাগনের কল্পনায় প্রাগৈতিহাসিক নানা জীবজন্তুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বৃহৎ কিছু কিছু সরীসৃপের স্মৃতি। এই শতকেই মালয়ে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এমন এক প্রাণী যা অনায়াসেই কল্পনার ড্রাগন হয়ে উঠতে পারত। ১০ ফিট লম্বা সেই বিশাল সরীসৃপকে স্থানীয় লোকেরা বলত কোমোডো। তবে কোমোডোরা থাকুক বা না থাকুক, ড্রাগন কিন্তু মানুষের কল্পনায় অনায়াসেই জন্ম নিতে পারত।

শুধু ড্রাগন কেন, ইউনিকর্ন, মৎস্যকন্যা, ফিনিক্স, সালামান্ডার, গরুড়, রক পাখি, লক সেন দানো। আরও কত কী! মানুষের কল্পনা যুগের পর যুগ ধরে সৃষ্টি করেছে আশ্চর্য এক চিড়িয়াখানা। সেখানে অবিশ্বাস্য রকমের জীবজন্তু আর রকমারি মানুষ।

ইউনিকর্নের কথাই ধরা যাক। কখনও মনে হয় মিল তার

ছাগলের সঙ্গে, কখনও ঘোড়ার সঙ্গে। কখনওবা কোনও সরীসৃপের সঙ্গে। ইউনিকর্নের বৈশিষ্ট্য তার মাথায় রয়েছে একখানা মাত্র শিং। পশ্চিমের উপকথায় ইউনিকর্ন নির্জনতা পছন্দ করে। যে হিংস্র, তাকে পোষ মানানো যায় না। চীনের উপকথায় আবার ইউনিকর্ন নম্র, ভদ্র, শান্তিপ্রিয়। ড্রাগনের মতোই সে সৌভাগ্যের প্রতীক। তবে পশ্চিমে, কি পুবে ইউনিকর্ন যেন শৌর্য আর শুদ্ধতার এক প্রতিকৃতি। ইউনিকর্নের শিং পৌরুষের পতাকা বিশেষ, তার দেহ আবার নারীর। ইউনিকর্নের শিং সম্পর্কে তৎকালে পশ্চিমের মানুষের ধারণা, তা অতি মূল্যবান বস্তু। এই শিং-এ পানপাত্র তৈরি করলে পানীয়ের বিষক্রিয়া থাকে না। ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমস ১৬০৩ সালে রাজকীয় প্রতীক হিসাবে সিংহের পাশাপাশি স্থাপন করেন ইউনিকর্নের প্রতিকৃতি।

কোথা থেকে এল এই ইউনিকর্নের ধারণা ? পশ্চিমের ইউনিকর্নের খবর প্রথম শোনা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৮ সাল অবধি। ভারত বিষয়ক একটি বইয়ে গ্রিক ঐতিহাসিক, কেটেসিয়াস



চীনা পেন ড্রইং-এ ইউনিকর্ন



কোথাও ইউনিকর্ন
পবিত্র প্রতীক
কোন্‌ল, ১৫৭০

আশ্চর্য এক প্রাণীর কথা বলেন। তিনি বলেন ভারতে এক ধরনের বন্য গাধা আছে। তারা ঘোড়ার মতো বড়। কোনাও কোনওটি এমনকি ঘোড়ার চেয়েও বড়। তাদের শরীর সাদা, মাথা ঘন লাল, চোখ ঘন নীল, আর তাদের কপালে রয়েছে দেড়ফুট লম্বা ছুঁচোলো একটি শিং। এটা ঠিক, ভারতে এখনও বুনো গাধা আছে। হিমালয় অঞ্চলে আছে বড় বড় হরিণ। কিন্তু ইউনিকর্ন স্পষ্টত কাল্পনিক এক প্রাণী। ইউনিকর্ন নিয়ে পশ্চিমে নানা কাহিনী। নানান ব্যাখ্যা সেই সব কাহিনীর। তবে একালে অনেক পন্ডিতের ধারণা ইউনিকর্ন কল্পনার পেছনে রয়েছে ভারতের এক শ্রেণীর গণ্ডার। হয়তো বা আবার ইউনিকর্ন যদি নিছক কাল্পনিক প্রাণী হয় তা হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। মৎস্যকন্যাদের আদি খুঁজতে গিয়েও কেউ কেউ পৌঁছেছেন সিল মাছে। ঘর ছাড়া ক্লান্ত নাবিকের কল্পনায় সিল কেমন করে মৎস্যকন্যায় পরিণত হতে পারে তা নিয়েও বিস্তর জল্পনা করেছেন তাঁরা। এ ক্ষেত্রেও কথা একটাই। মৎস্যকন্যা নিছক কল্পনাও হতে পারে। হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এ কালেও কিন্তু মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন প্রাণী। প্রায় পৌনে দুশো বছর আগেকার কথা। ইংরেজ তরুণী মেরি উলস্টোন ক্রাফট-এর সঙ্গে বছর দুই হল বিয়ে হয়েছে কবি পার্সি বেশি শেলির। ওঁরা তখন সুইজারল্যান্ডে কবিবন্ধু লর্ড বায়রনের অতিথি। লেক জেনেভার ধারে বায়রনের বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা বসে। ওঁরা তিনজন ছাড়া সেখানে হাজির থাকেন একজন ডাক্তার বন্ধুও। শীতের রাত, ফায়ার প্লেসের ধারে গল্প চলে। সাধারণত ভূতের গল্প কিংবা ভয়ের গল্প। একদিন বায়রন প্রস্তাব করলেন, এসো, প্রত্যেকেই আমরা একটা সত্যকারের ভয়ের গল্প লিখি। যার গল্প সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারবে সেই হবে সেরা গল্পকার। মেরি আগে কখনও কিছু লেখেন নি। তাঁকেও প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে। তিনি ভেবে পান না কী লিখবেন। ইংলন্ডে এক ডাক্তার তখন গবেষণাগারে কীসব পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। লোকেরা বলাবলি করছিল এমন দিন

আসছে যখন মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি করা যাবে। প্রয়োজনে এক সঙ্গে সব জুড়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত যাবে। সূত্র বলতে ওই টুকু। মেরি শেলি লিখে ফেললেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গল্প। বইয়ের নাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অর দি মডার্ন প্রমিথিয়ুস। এই বইয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন কবিপত্নী মেরি শেলি। সংস্করণের পর সংস্করণ। তৈরি হল চলচ্চিত্র ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। সেও কিন্তু কল্পনারই সৃষ্টি।

এরকম সৃষ্টি একালে আরও হয়েছে। ১৯১৪ সালে জার্মানিতে তৈরি হয় এক চলচ্চিত্র, দি গোলেম। গোলেম একটা মাটির মূর্তি। একজন প্রত্নবস্তুর সংগ্রহকারী দোকান থেকে সেটি কিনে ঘরে তুলে এনেছিলেন। মূর্তিটি হঠাৎ প্রাণ পেয়ে যায়। ওই পুরানো শিল্প-বস্তুর কারবারির কাছে সে ভৃত্যের কাজ করে। তারপর তাকে দিয়ে নানা কাণ্ড এবং অবশেষে গোলেমের মৃত্যু। অনেকটা একই ধরনের কাহিনী—কিং কং। অংশত এডগার ওয়ালেসের লেখা। ১৯৩৩ সালে দৈত্যকায় এই গোরিলাকে নিয়েও একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়। অনেক চাঞ্চল্যকর কাণ্ডের পর কিং কং শেষ পর্যন্ত



ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-এর ছবি,
১৮৩১ সালে প্রকাশিত

মারা যায় তৎকালের আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে পড়ে। ড্রাগনের মতো এই সব অতিকায় প্রাণীরাও শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। সুপারম্যান, ফ্যাণ্টম, ব্যাটম্যান বা স্পাইডারম্যান তাদের কথা অবশ্য অন্য।

এই সব কল্পলোকের প্রাণীদের কথা ভাবলে মনে হয় না কি, সেই আদিম কাল থেকেই রকমারি সব কিম্ভূত অদ্ভুত প্রাণী আর দৈত্য-দানোর নিবাস মানুষের মনের গভীরে? আদিমকালে প্রকৃতির সব কিছুই যখন মানুষের কাছে ভয় এবং বিস্ময়ের বিষয় তখন অপরাজেয় প্রাকৃতিক শক্তি অদ্ভুত-কিম্ভুতের বেশে তার কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে তুলবে, সেটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তা ছাড়া সেদিনের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যেখানে বিরাট সমস্যা, সেখানে এই সব কল্পনা মানুষকে কিছুটা মুক্তির সন্ধানও দিয়েছিল হয়তো। তাদের নিয়ে নানা কাহিনী রচনা করে ক্ষুধা, ব্যাধি এবং বাস্তব শত্রুর আতঙ্ক থেকে সাময়িকভাবে হলেও কল্পনার জগতে পালিয়ে যেতে পারত সে। নতুন নতুন চাইছে, তার সেই আদিম প্রকৃতির রেশটুকু। নয়তো এই বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতির রহস্য এখন প্রায় উদ্‌ঘাটিত তখনও কেন লেখকের কলমে সৃষ্ট হবে নতুন প্রাণী। কিংবা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আবির্ভূত হবে অত্যদ্ভুত কিম্ভূত ভয়াবহ সব প্রাণীর দল। এই সৃষ্টিকর্মে বিজ্ঞানকেও কাজে লাগাচ্ছেন আজকের কল্পনাপ্রবণ মানুষ। কেননা, দৈত্য-দানো ছাড়া আমাদের চলে না। পরিচিতের ভিড়ে আমরা অপরিচিতকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। অতি বৃহৎ, অতি শক্তিশালী আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা একই সঙ্গে তাকে ভয় করি, আবার শ্রদ্ধাও করি। তার যখন পতন ঘটে তখন আবার আমাদের মনে অন্য ধরনের শিহরণ। ড্রাগন যখন অচেনা দেশে রাজকুমারীর দিকে থাবা বাড়ায় আমরা তখন আতঙ্কে শিউরে উঠি। সেণ্ট জর্জ যখন ড্রাগনকে হত্যা করে নির্দোষ সেই তরুণীকে উদ্ধার করেন, তখন আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি, আনন্দে হাততালি দিই। আমরা প্রত্যেকেই তখন মনে মনে এক একজন ড্রাগন হত্যাকারী।

কিং কং
এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ



যত কাণ্ড ঘোড়া-মানুষদের নিয়ে

অর্ধেক তার মানুষের মতো, বাকি অর্ধেক ঘোড়ার মতো। এই ঘোড়ামানুষ দেখেছ কেউ? না, কোনও রাজার ঘোড়াশালে তার দেখা মিলবে না। কোন চিড়িয়াখানায়ও না। আমাদের কবি সুকুমার রায় হাঁস আর সজারু মিলিয়ে গড়েছিলেন—'হাঁসজারু'। বক আর কচ্ছপ মিলিয়ে—'বকচ্ছপ'। কিন্তু ঘোড়া-মানুষ নাকি মোটেই সেধরনের কোনও মনগড়া প্রাণী নয়। একসময় নাকি সত্যিই দলে দলে ঘুরে বেড়াতো তারা। মানুষেরা নাম দিয়েছিল তাদের—সেন্টোর। ঘোড়ার হত মতো চারটে পা, আবার মানুষের মতো দু'খানা হাত।

এই ঘোড়া-মানুষদের আস্তানা ছিল পুরানো দিনের গ্রিসে। গ্রিসের থেসালি বলে একটা এলাকায়। সেখানকার বনে আর পাহাড়ে তারা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। নাচ গান হল্লা করতো। কখনও বা তুমুল লড়াই। কিন্তু চিরকাল কি আর একভাবে চলে? একবার তারা লড়াই বাঁধিয়ে বসলো গ্রিকদের সঙ্গে। আর যায় কোথা? গ্রিকদের প্রিয় নায়ক হেরাক্লিস এগিয়ে গেলেন তাদের বিরুদ্ধে। মস্ত বীর তিনি। রোমানরা তাঁকেই বলে হারকিউলিস। সুতরাং বুঝতেই পারছো তিনি ঘোড়া-মানুষদের মারতে মারতে একেবারে শেষ করে দিলেন। বেঁচে রইলো মাত্র দু'চারজন। ঘোড়া-মানুষদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী গুণী একমাত্র তাঁদেরই খাতির করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি। গ্রিকদের সঙ্গে



ঘোড়া-মানুষ
ফরাসি এনগ্রেভিং

রীতিমত বন্ধুত্ব হয়ে গেল তাঁদের। মানুষের সঙ্গে এত গলাগলি ভাব, দেখে কে বলবে, ওরা ঠিক মানুষ নয়, ঘোড়া-মানুষ!

কত কান্ড এই ঘোড়া-মানুষদের নিয়ে। তাদের ছবি আঁকা হয়েছে। মূর্তি গড়া হয়েছে। দিস্তা দিস্তা লেখা হয়েছে তাদের নিয়ে। তবু সকলে কিন্তু বিশ্বাস করেনা—এক সময় সত্যিই ঘোড়া-মানুষ ছিল পৃথিবীতে । অনেক, অনেকদিন আগে একজন গ্রিক পন্ডিতই বলেছিলেন—এসব স্রেফ বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

তাহলে এই ঘোড়া-মানুষের কথা এলো কোথা থেকে? সে একটা প্রশ্ন বটে। কেউ কেউ মনে করেন—ঘোড়ামানুষরা আসলে মানুষই। এমন মানুষ যাদের প্রতীক ছিল ঘোড়া। কিংবা তারা

ঘোড়ার পুজো করতো। অন্যরা বলেন—আসলে ওদের ঘোড়ামানুষ হলেও ওরা ছিল বন্য।

সেটা কিন্তু হতে পারে। যেমন আমাদের দেশের রাক্ষস কিংবা অসুর। ওরা তো আসলে মানুষই। স্বভাবের জন্যই তারা অন্যদের চোখে রাক্ষস কিংবা অসুর।

এখানেই শেষ নয়। কারও কারও মতে ঘোড়া-মানুষ আসলে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার মানুষের দল। এখনও ঘোড়সওয়ারকে কিন্তু পশ্চিমে বলা হয়—হর্সম্যান ; যেন মানুষ এবং ঘোড়া আলাদা নয়, দুইয়ে মিলে এক। যারা আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি। তারা যদি হঠাৎ দেখে টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধুলোর মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে যোদ্ধার দল তবে কি ভাববে তারা? নিশ্চয় ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিজেদের সর্দারকে বলবে—এবার আর রক্ষা নেই। অদ্ভুত একদল লড়িয়ে আসছে। তারা না মানুষ, না জন্তু। এ-কাণ্ড ঘটেছে একালেও। ঘোড়ার পিঠে বসা ইউরোপীয় আগন্তুকদের দেখে আমেরিকার আদিবাসীদের সে কি দৌড়! কে জানে হয়তো এমনি করেই একদিন ভয়ে ছুটতে ছুটতে আর পিছু তাকাতে তাকাতে একদিন আদ্যিকালের গ্রিকরা দেখেছিল প্রথম ঘোড়া-মানুষ,—'সেনটোর'!

বালক ঘোড়া-মানুষ
লন্ডন, ১৫২০



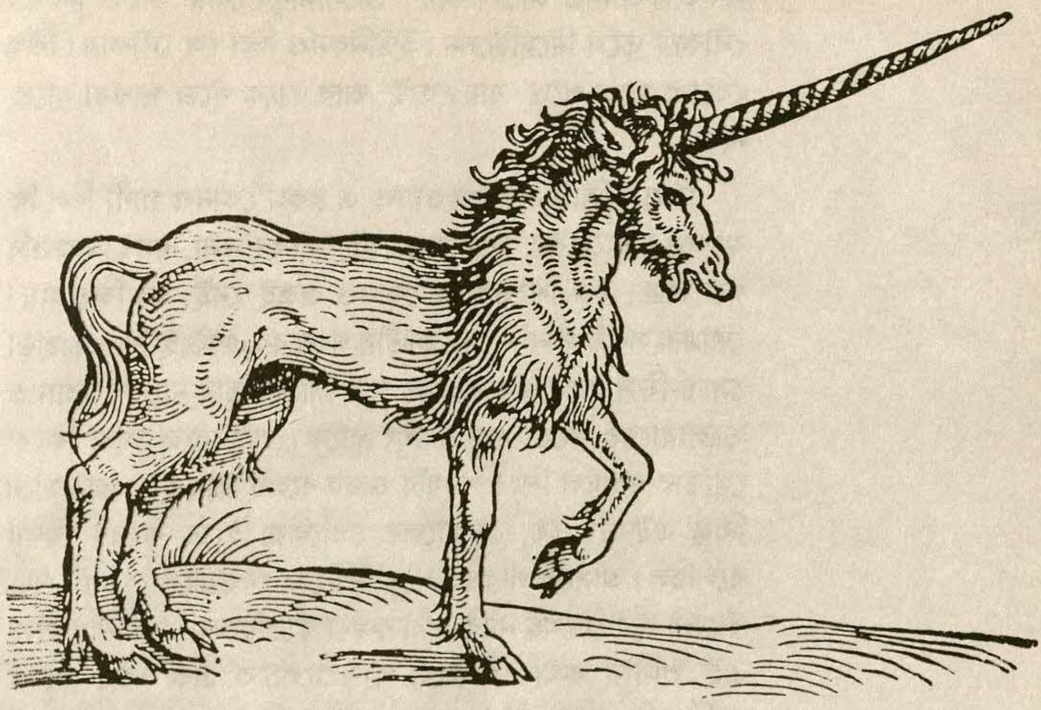
ইউনিকর্ন-এর শিং ছিল

বলতে পার যিশুর জন্ম কবে? সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজে অনেকেই বলে দেবে—এক হাজার নয়শ তিরানব্বই বছর আগে। এ হিসেবটা কিন্তু মোটেই কঠিন নয়। তারও চারশ' বছর আগের কথা। একজন গ্রিক পন্ডিত একটা খবর বলে সবাইকে একদিন চমকে দিলেন। বনের খবর। তিনি বললেন—ভারতে এক ধরনের বুনো গাধা আছে। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, মাথাটা লালচে, আর চোখ দুটি ফুটফুটে নীল। আর তার চেয়েও আজব ব্যাপার যে গাধার কপাল ফুঁড়ে বের হয়েছে মস্ত ধারালো একখানা শিং। হ্যাঁ, একখানা।

কথাটা ঠিক। সাক্ষী দিলেন একজন রোমান পন্ডিত। তবে কি জান, জন্তুটা ঠিক গাধা নয়। ওর শরীর আসলে ঘোড়ার মতো। আর মাথাটা অবিকল হরিণ যেন। তাছাড়া, পায়ে ওর খুর নেই। তবে সে-সব কিছু নয়, আসলে দেখবার জিনিস ওই শিংটা। কপালের ঠিক মধ্যিখানে।

সেই থেকে সকলের মুখে মুখে সেই আজব জন্তুর গল্প। নাম দেওয়া হল তাকে—ইউনিকর্ন। শব্দটা বাংলা বা ইংরাজী নয়, লাতিন। অর্থ—যার একখানা মাত্র শিং।

তবে ইউনিকর্ন যেমন খাতির পেয়েছে তেমন বুঝি আর কারও ভাগ্যে জোটে না। পশ্চিমে রাজা-রাজরাদের বাড়ির ফটকে,



ইউনিকর্ন। জুরিখ, ১৫৫১

সিংহাসনে ; শিলমোহরে—অনেক কিছুতেই এই ইউনিকর্ন এর মূর্তি। সিংহের মতোই সম্মান তার। ইউনিকর্ন অনেকের চোখে রীতিমত পবিত্র। আমাদের দেশে কারও কারও চোখে গরু যেমন। তাছাড়া ইউনিকর্ন-এর শিং-এর নাকি অনেক গুণ। সেকালে রাজাদের খাবার টেবিলে এক টুকরো ইউনিকর্ন-এর শিং ফেলে রাখা হত। কারণ খাবারে কেউ বিষ মিশিয়ে দিলে দেখা যাবে শিংটুকু নিজে নিজে ঘেমে উঠেছে!

সুতরাং, সব রাজার এক হুকুম—শিং চাই। ইউনিকর্ন-এর শিং। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত শিং? ইউনিকর্ন মোটে দেখাই যায় না। দেখতে পেলেও তাকে ধরা নাকি খুবই শক্ত।

অনেক শিকারী এ ভাবে চেষ্টা করেও যখন ইউনিকর্ন ধরতে পারছে না, কেবল হয়রানিই তাদের সার হচ্ছে তখন শোনা গেল অন্য কথা। পন্ডিতেরা বললেন সেই যেবার বানের জলে পৃথিবী ভেসে যায় ইউনিকর্ন তখন থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছে না। আর

সব জন্তু এখনও আছে। কারণ ভালোমানুষ নোয়া তাদের নিজের নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। ইউনিকর্নও ছিল সে নৌকায়। কিন্তু বেচারা জলে পড়ে যায়। তাই আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু সত্যিই এক শিংওয়ালা এ রকম কোনও প্রাণী ছিল কি কখনও? আজকের দিনে অনেকেই বলবেন—না, এসব আজগুবি গল্প মাত্র। এক শিংওয়ালা কোনও জন্তুই নেই, তা কিন্তু নয়। তোমরা সবাই জান—এক জাতীয় গণ্ডারের একটাই শিং। তাছাড়া সোর্ড-ফিস নামে এক ধরনের মাছ আছে। তার নাকের ডগায়ও তলোয়ারের মতো একটা শিং থাকে। তাই বলে গাধা কিংবা ঘোড়ার কপালে শিং? খবরটা গুজব বলেই মনে হয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সেকালের লোকেরা ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলেছিল। আসলে পারস্য দেশে মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা ষাঁড়ের ছবি দেখেই নাকি ওরা কল্পনা করেছিলেন এক শিংওয়ালা এই প্রাণীর কথা। শিল্পীরা ষাঁড়গুলোকে এক পাশ থেকে দেখিয়েছিলেন বলেই শিং দেখানো হয়েছিল একখানা করে। এক পাশ থেকে মানুষ আঁকলেও কিন্তু একটা চোখ, একটা কান দেখা যায়। তাই নিয়ে এখন আর কেউ নিশ্চয় সোরগোল বাঁধায় না। সেকালে ওরা সবে নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন প্রাণী দেখছেন, এক শিং নিয়ে তাই এমন হল্লা।

ইউনিকর্ন
চীনা পেন ড্রইং-এ



ড্রাগন মোটেই ভয়ঙ্কর নয়

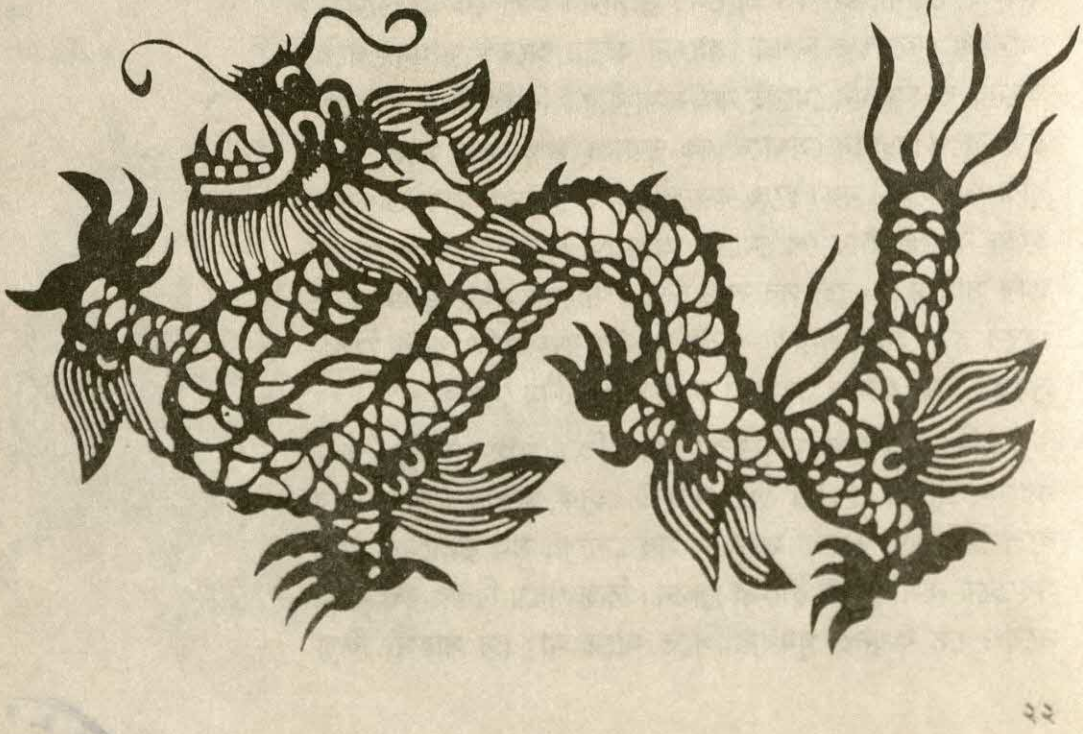
কারও দুটো পা। কারও চারটে। কারও পাখা আছে, কারও নেই। কারও শিং আছে, কারও নেই। কিন্তু সকলের গায়েই মাছের মতো আঁশ। সকলের পায়েই ছুরির মতো ধারালো নখ। সকলেরই রয়েছে সাপের মতো লম্বা লেজ। তাছাড়া চিনবার আর এক উপায় প্রত্যেকের মুখে রয়েছে লকলকে জিভ। নিঃশ্বাসে কখনও ধোঁয়া, কখনও আগুন। ড্রাগনের কথা কে না শুনেছে? অনেকে দেখেছও নিশ্চয়। গল্পের বইয়ে অনেক ড্রাগন। গল্পের অনেক বীর ড্রাগন মেরেই নাম-করা বীর। বিশেষ করে পশ্চিমে। ইউরোপে। ড্রাগন সেখানে এক ভয়াবহ জন্তু। তার মতো হিংস্র বুঝি আর কেউ নয়। ইচ্ছে করলে সে জলে ডুবে থাকতে পারে। ইচ্ছে করলে আকাশে মেঘের আড়ালে পালিয়ে যেতে পারে। তার সামনে পড়লে সব লন্ড ভন্ড। গরমের সময় ড্রাগন হাতি মেরে রক্ত শুষে খায়। কারণ হাতির রক্ত নাকি খুবই ঠাণ্ডা! সুতরাং, রক্ত হলেও ড্রাগনের কাছে আইসক্রীম সোডা!

এদিকে চীনের মানুষের চোখে কিন্তু ড্রাগন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাণী। চেহারা তার যেমনই হোক, স্বভাব চরিত্রে যাকে বলে রীতিমত ভালো মানুষ। সব দেশের সব ড্রাগনের মধ্যে সবচেয়ে নামী ডাকী চীনের ড্রাগন। কিন্তু গায়ে বিস্তর বল থাকা সত্ত্বেও সে কখনও খুনখারাপিতে মাতে না। সে সাহসী কিন্তু

উদার। শক্তিমান, কিন্তু সাধারণত খুবই শান্তশিষ্ট। মাটিতে সে ধন দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধিকে পাহারা দেয়। আকাশ বাতাস সব তার বশ। আকাশে তার পিঠেই দেবতাদের যত ঘর বাড়ি। সে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরায়। তার এমনি আরও নানা ভালো ভালো কাজ। সেকালে চীনাদের সম্রাট যখন মারা যেতেন তখন ড্রাগনের পিঠে চড়েই স্বর্গে যেতেন তাঁরা।

কিন্তু আজব ব্যাপার, ইউরোপে তো নয়ই, ড্রাগনের দেশ চীনেও কিন্তু আজ ড্রাগন নেই। আমাদের দেশে তবু ময়াল সাপের পিঠে পাখা, আর পেটের নিচে পা খাটিয়ে মনে মনে ড্রাগন জাতীয় কোনও একটা প্রাণী তৈরি করা যায়। গোসাপ, গিরগিটি কিংবা বহুরূপীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়েও হয়তো বানানো যায় এক ধরনের ড্রাগন। কিন্তু চীনারা কথায় কথায় এতো ড্রাগন পেল কোথায়? অনেকে বলেন—একদিন এই ড্রাগন খুঁজে পেয়েছিল ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে। মেঘের মধ্যে। বর্ষার

চীনের ড্রাগন





অন্ধকারের ড্রাগন
ইংরেজি বই থেকে,
এডিনবার্গ, ১৭২১

আকাশ ক্ষণে ক্ষণে পালটে যাচ্ছে মেঘের চেহারা আর রঙ। তর্জন গর্জন। বিদ্যুৎ চমক। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া। বৃষ্টি। ঝড়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনও এক দুপুরে কি সন্ধ্যায় তাকিয়ে দেখো। মনে হয়, চেষ্টা করলে ড্রাগন দেখতে পারবে তোমরাও।

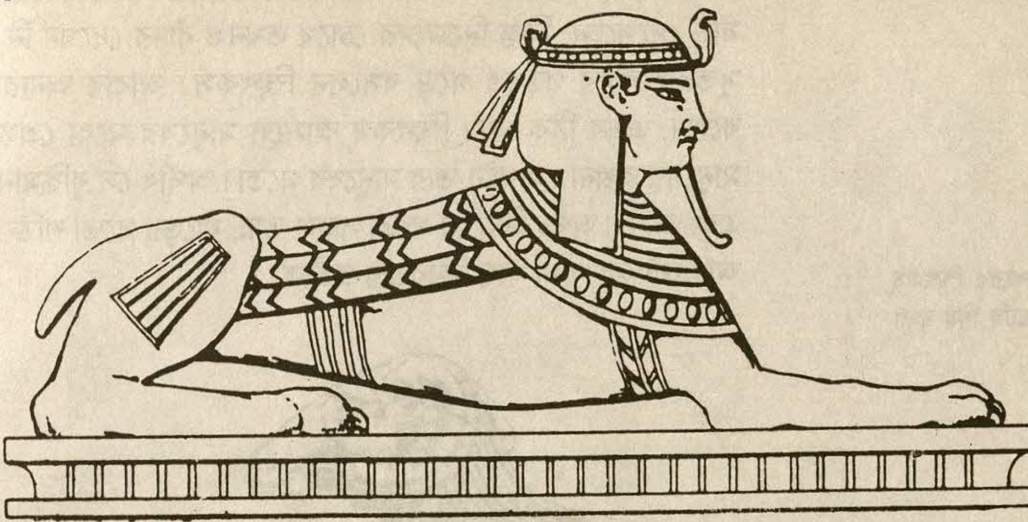
এখনও ধাঁধা

অবিকল মানুষের মতো মুখ। মাথায় সুন্দর মুকুট। শরীরটা কিন্তু যণ্ড-মার্কা, —ষাঁড়ের মতো। অথচ পাগুলো যেন সিংহের কাছ থেকে ধার করে আনা ; থাবায় ধারালো নখ। এদিকে পিঠে পাখির মতো পাখনা।

এক সঙ্গে চার চারটি প্রাণী। যাকে বলে—একের ভেতরে চার। মানুষ, ষাঁড়, সিংহ আর ঈগল। চার মিলে এক, তাই বুঝি নামটাও একটু খটমট—স্ফিংক্স! মিশরের কথা উঠলেই পিরামিড আর এই স্ফিং কস্ এর কথা। দুই-ই দেখবার মতো।

সব স্ফিংক্স অবশ্য দেখতে এক রকম নয়। চেহারায় রকমফের আছে। কারও মাথায় মানুষের বদলে হয়তো ভেড়া কিংবা পাখির মুন্ডু। কারও পাখা নেই। কারও লেজ নাকি আবার সাপের মতো। তাছাড়া, শুধু মিশরে নয়, স্ফিংকস অন্য দেশেও আছে। ছিল। তবে দেখবার মতো স্ফিংকস বটে চার প্রাণী মিলে যে এক, সেটাই।

স্ফিংকস মাত্রই খুব জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান। জ্ঞানীরা কথা বলেন কম। স্ফিংকসও হাজার হাজার বছর ধরে মৌন, একদম চুপচাপ। একমাত্র কথা বলতো গ্রিসের এক স্ফিংকস। সামনে দিয়ে যাবার উপায় নেই। গেলেই সে ধাঁধা জিজ্ঞেস করবে।



গ্রিস-এর স্ফিংকস্,
লৌহমূর্তি

“আচ্ছা বল তো কোন্ প্রাণী সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুই পায়ে, আর সন্ধ্যায় তিন পায়ে?”

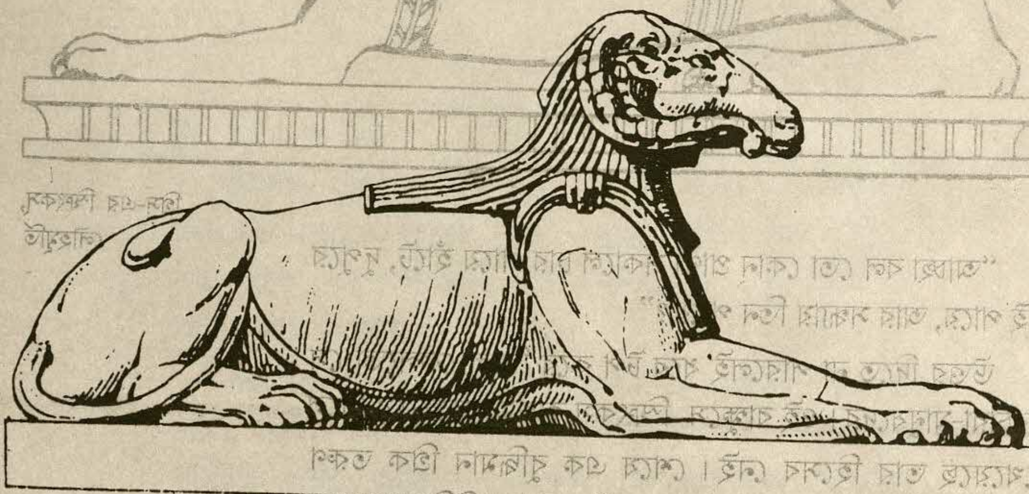
উত্তর দিতে না পারলেই ধরে টপ করে গিলে ফেলতো সে বেচারা-মানুষদের। ওই রাক্ষুসে স্ফিংকস কত মানুষকে যে গিলে খেয়েছে তার হিসেব নেই। শেষে এক বুদ্ধিমান গ্রিক তরুণ বললেন, “হুঁ এই তোমার ধাঁধা? শোন উত্তর বলে দিচ্ছি ! আসলে তুমি মানুষদের কথাই বলছো? ছোটবেলায় আমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলি। আমাদের তখন চার পা যেন। বড় হলে আমরা দু -পায়ে হাঁটি। বুড়ো হলে চলি লাঠিতে ভর দিয়ে। আমাদের তখন তিন পা। নাও হলো তো!”

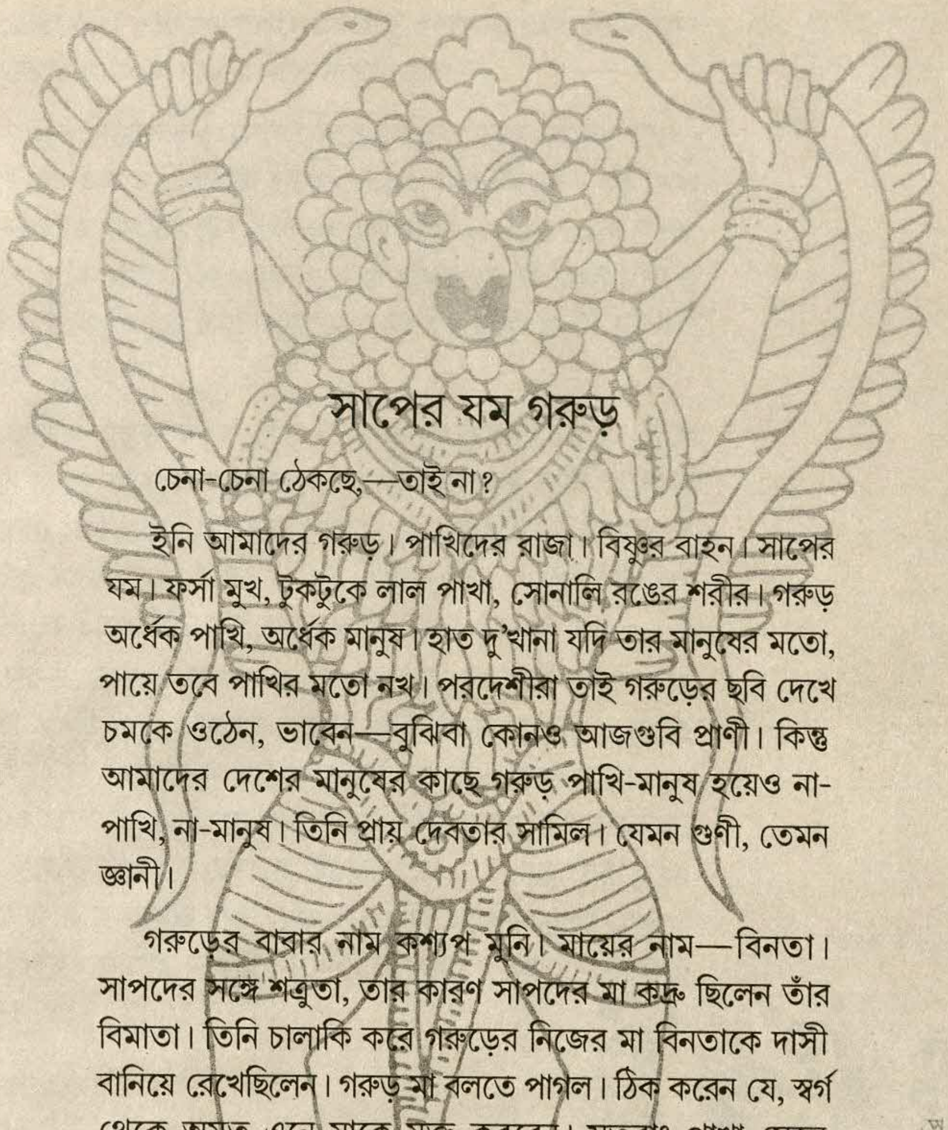
কেউ যা পারে না, এই ছেলেটি সহজেই তা পেরে গেল! মনের দুঃখে স্ফিংকস বেদী থেকে ঝাঁপ দিল মাটিতে। সেই থেকে সেও নির্বাক, মুখে রা-টি নেই !

তবু স্ফিংকস কিন্তু নিজেই এখনও ধাঁধা। মানুষ কোথা থেকে পেল এমন আজব প্রাণীর সন্ধান? কোনো কোনো পন্ডিত বলেন—স্ফিংকস আসলে আমাদের বাঁদর। ওই দেশের লোকেরা শুনেছিল, বাঁদরের মুখটা অনেকটা মানুষের মতো, যদিও

শরীরটা তার জন্তুর মতো। ওঁরা সিংহ দেখেছেন, ভেড়া দেখেছেন, ষাঁড় দেখেছেন, কিন্তু নিজেদের চোখে তখনও বাঁদর দেখেন নি। সুতরাং বাঁদর গড়তে গড়ে বসলেন স্ফিংকস! আবার অন্যরা বলেন, এসব ঠিক নয়। স্ফিংকস আসলে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষের কল্পনা। মাথাটা তার মানুষের মতো। অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। অথচ সিংহের মতো সাহস তার, ষাঁড়ের মতো শক্তি। আর গুটানো পাখা শান্ত নীরবতার প্রতীক।

মিশরের স্ফিংকস্
ফরাসি শিল্প কলা





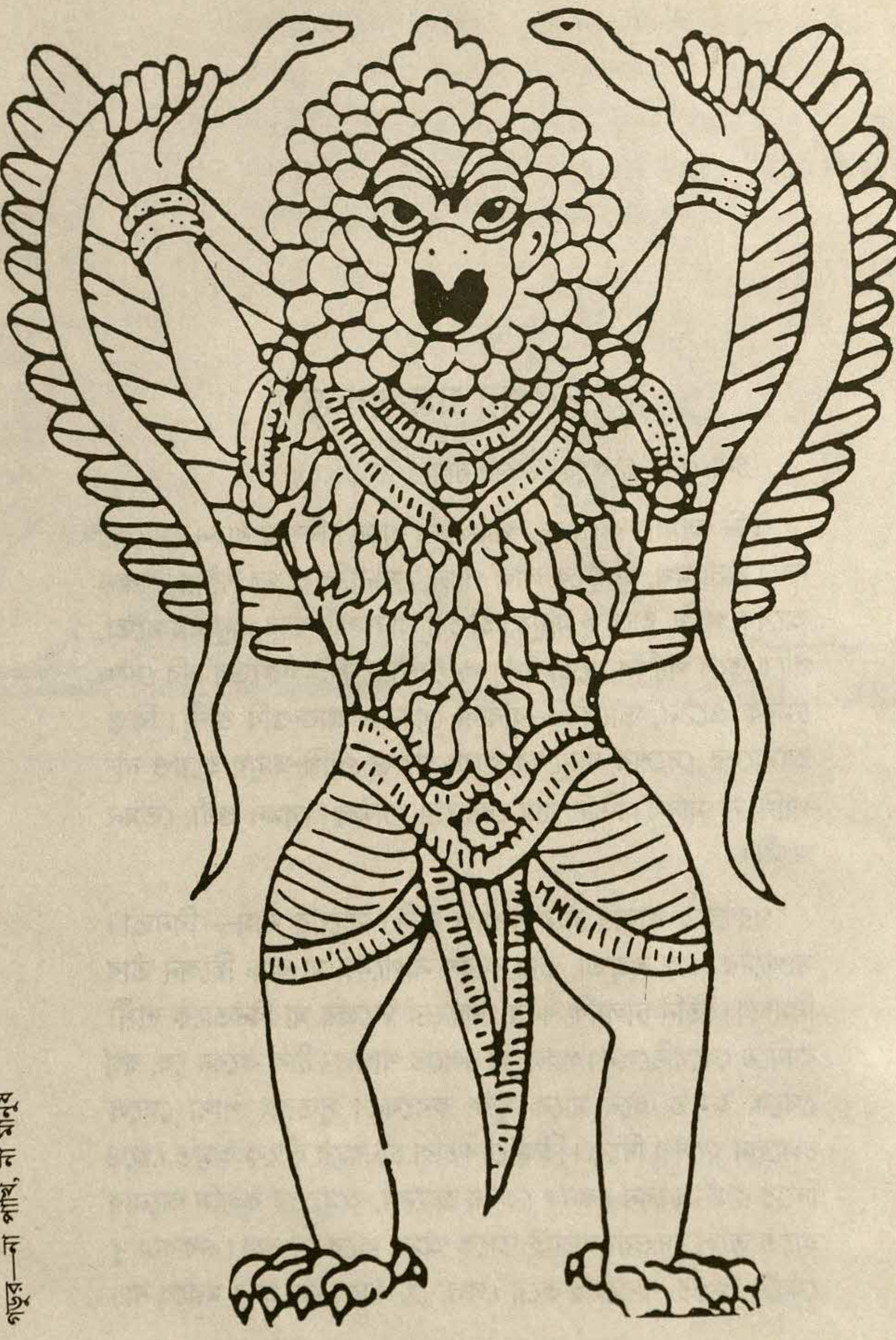
গরুড়—না পাখি, না মানুষ

সাপের যম গরুড়

চেনা-চেনা ঠেকছে,—তাই না?

ইনি আমাদের গরুড়। পাখিদের রাজা। বিষ্ণুর বাহন। সাপের যম। ফর্সা মুখ, টুকটুকে লাল পাখা, সোনালি রঙের শরীর। গরুড় অর্ধেক পাখি, অর্ধেক মানুষ। হাত দু'খানা যদি তার মানুষের মতো, পায়ে তবে পাখির মতো নখ। পরদেশীরা তাই গরুড়ের ছবি দেখে চমকে ওঠেন, ভাবেন—বুঝিবা কোনও আজগুবি প্রাণী। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের কাছে গরুড় পাখি-মানুষ হয়েও না-পাখি, না-মানুষ। তিনি প্রায় দেবতার সামিল। যেমন গুণী, তেমন জ্ঞানী।

গরুড়ের বাবার নাম কশ্যপ মুনি। মায়ের নাম—বিনতা। সাপদের সঙ্গে শত্রুতা, তার কারণ সাপদের মা কদ্রু ছিলেন তাঁর বিমাতা। তিনি চালাকি করে গরুড়ের নিজের মা বিনতাকে দাসী বানিয়ে রেখেছিলেন। গরুড় মা বলতে পাগল। ঠিক করেন যে, স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মাকে মুক্ত করবেন। সুতরাং পাখা মেলে চললেন স্বর্গের দিকে। কিন্তু দেবতারা চট করে তাঁকে অমৃত ছেড়ে দিতে রাজী হবেন কেন? কে না জানেন, অমৃতের কলসি অন্যের হাতে তুলে দেওয়া মানেই তাকে অমর করে দেওয়া। একবার দু ফোঁটা খেতে পারলেই হয়ে গেল, যে খাবে সে আর মরবে না।



গড়ুর—না পাখি, না মানুষ

সুতরাং জোর লড়াই হলো। কিন্তু দেবতারা গরুড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তাতেও গরুড়ের কিচ্ছু হলো না। ইন্দ্রের সম্মান রাখতে তাঁর একটা পালক খসে পড়েছিল মাত্র!

অমৃত নিয়ে গরুড় সোজা এসে হাজির হলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তো অবাক। ছেলেটা হাতে পেয়েও অমৃত নিজে একটু খেল না—অদ্ভুত ছেলে বটে! তিনি বললেন—অমৃত না খেলেও আজ থেকে তুমি অমর। আর এখন থেকে তুমিই আমার বাহন। গরুড় সেই থেকে বিষ্ণুর উড়োজাহাজের মতো। বিষ্ণুকে নিয়ে কাঁহা কাঁহা উড়ে চলেন।

অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন গরুড়। সব বলতে গেলে দিস্তা দিস্তা কাগজেও কুলোবে না। ক্রমে সব জানতে পারবে। রামায়ণ মহাভারতে গরুড়ের অনেক গল্প রয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় লক্ষণ যখন সাপের বাঁধনে পড়ে ছটফট করছেন, তখন কে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন?—তিনি এই গরুড়।

গরুড় কোনও আজব প্রাণী নয়, আসলে আমাদের মনের মতো একটি পাখি। মানুষও পাখির মতো উড়ে যেতে চায় সূর্যের দিকে। মনে মনে মানুষ তা-ই কল্পনা করেছিল এমন মানুষ, যে পাখির মতো উড়তে পারে, স্বর্গ থেকে নিয়ে আসতে পারে অমৃত। আমরা বলি প্যাঁচার মতো মুখ, টিয়ার মতো ঠোঁট। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন কখনও-কখনও পাখির আদল দেখতে পাই, তখন পাখির মধ্যেই বা মানুষের ভাব থাকতে পারবে না কেন?

পাখিদের রাজা গড়ুর



কুমির নয়, যেন নেকড়ে

—আহা, লোকটাকে বুঝি খেয়েই ফেলল!

যা রাক্ষুসে জন্তু! ছুঁচলো দাঁত, আর নখ। করাতের মতো পিঠ, করাতের মতো লেজ। পায়ে কাঁটা, গায়েও কাঁটা। দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। ধরেছে যখন, আর নিস্তার নেই। ইচ্ছে করছে হাতের কাছে যা আছে তা-ই ছুড়ে মারতে, —তাই না?

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, লোকটা আসলে সার্কাসের খেলোয়াড়। খেলা দেখাচ্ছে। তাহলে তো কথাই নেই, মুখ থেকে বার হয়ে এলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কিন্তু সে-ধরনের কোনও সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না। কারণ এটা নাকি কুমির। বাঘ সিংহ নয়, কুমির। চোখে দেখার আগে স্রেফ কানে শুনে আঁকা কুমির। এঁকেছিলেন রোমের এক শিল্পী। কুমির নিয়ে খেলা তো পরের কথা, রোমানরা তখনও কুমির চোখেই দেখেননি। কেঁদো-কুমির, মেছো-কুমির—কিছুই না। কনাঘুষোয় কুমিরের খবরটা মোটামুটি জেনে গেছেন এই পর্যন্ত।

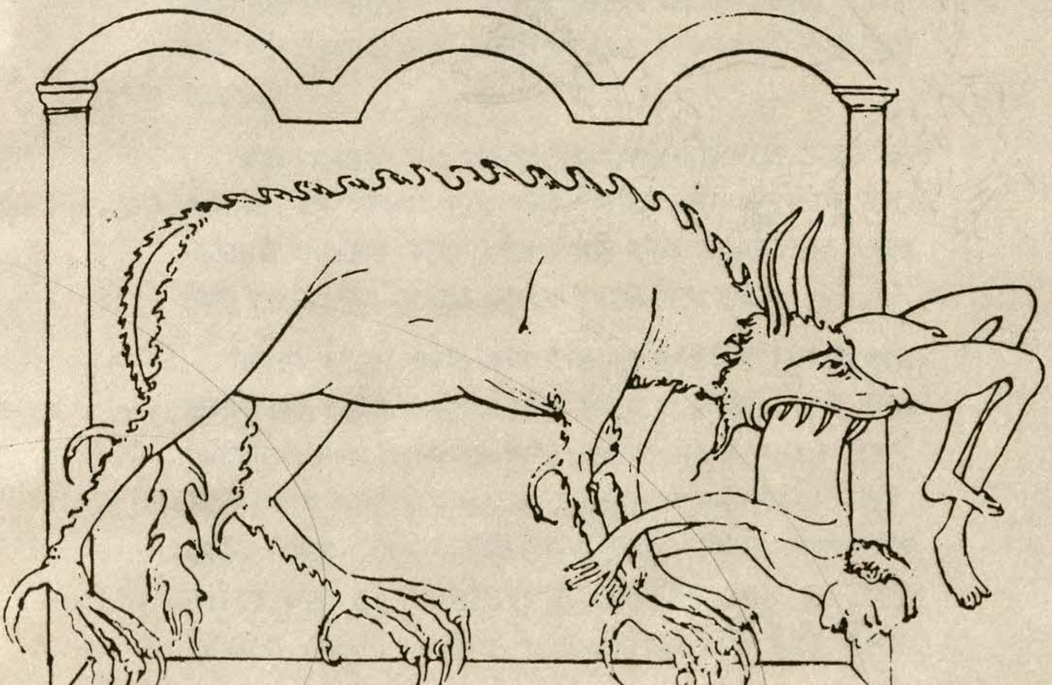
একজন রোমান পন্ডিত লিখলেন —মিশরের নীল নদে এক ভয়াবহ জন্তুর বাস। তারা লম্বায় তিরিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। গায়ের রঙ হলদেটে, অনেকটা জাফরানের মতো। তারা উভচর।

রাত্তিরে জলে থাকে, দিনের বেলায় উঠে আসে ডাঙায়। ডাঙাতেই ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কুমির অত্যন্ত হিংস্র। ধারালো তাদের দাঁত আর নখ। গায়ের চামড়া খুবই শক্ত। বড় বড় পাথর ছুড়ে মারলেও ওদের লাগে না। মজার ব্যাপার এই, খাওয়ার সময় ওদের ওপরের চোয়াল ওঠানামা করে, কিন্তু নীচের চোয়াল একদম নড়ে না।

তাও কি কখনও হয়? তবে এসব ছোটখাটো ভুলের জন্য তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি তো তবু কুমিরের মোটামুটি একটা খসড়া দিতে পেরেছেন। তার অনেকদিন পরে কিন্তু আর-এক পন্ডিত লিখেছিলেন—ডিম ফোটার পর যে বাচ্চাগুলো জলে নেমে যায়, বড় হয়ে সেগুলো হয় কুমির ; আর যারা ডাঙায় থেকে যায়, তারা হয় গোসাপ কিংবা গিরগিটি!

যা হোক, বিবরণ শুনে শিল্পী তক্ষুনি বসে গেলেন কুমির আঁকতে। ফল দাঁড়ালো এই। বড় বড় পা, লম্বা খাড়া কান, লম্বা

যা রাক্ষুসে জন্তু!



লেজ। কুমির যে বলতে গেলে বুকে হাঁটে, সে-ব্যাপারটাই ধরতে পারেননি উনি। কুমির নয়তো, যেন নেকড়ে বা হায়না গোছের কোনও প্রাণী! ওঁকে কোনও চিড়িয়াখানায় এনে কুমিরের আস্তানার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে নিশ্চয় লজ্জায় জিভ কাটতেন।

আর, ওই বেচারার যদি আমাদের দেশের কুমিরের গল্পগুলো পড়া থাকতো, তাহলে হয়তো বাঁচার একটা চান্স ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের সেই শেয়ালপন্ডিত আর কুমিরের গল্পটা মনে আছে তো? কুমির যেই না তার ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে, শেয়াল একদম ঘাবড়ে না গিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আরে আমার লাঠিগাছটা ধরে টানাটানি করছে কে?"

বোকা কুমির আমনি ছেড়ে দিল তার পা।



আগুনে পোড়ে না স্যালামান্ডার

আগুনে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পোড়ে না শুধু স্যালামান্ডার। অথচ স্যালামান্ডার কোনও জাদুকরের নাম নয়, সে সামান্য একটি চারপেয়ে প্রাণী। টিকটিকি কিংবা গিরগিটি যেমন।

দেখতে টিকটিকির মতো বটে, কিন্তু গুণে গরিমায় টিকটিকির সঙ্গে স্যালামান্ডারের বুঝি কোনও তুলনাই হয় না। হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বময় তার নামডাক। এমন আজব প্রাণী নাকি আর হয় না!

আজব নয়তো কী? স্যালামান্ডার আগুন দেখলে মোটে ভয় পায় না। ভয় পাওয়া দূরে থাক, আগুন বরং সে ভালবাসে। দাউদাউ আগুনের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে স্যালামান্ডার। তার কিচ্ছু হয় না। বরং দেখতে দেখতে আগুন নিবে যায়।

স্যালামান্ডারের শরীর এমন ঠান্ডা যে ভাবাই যায় না। বালতি বালতি জল আর চাপ চাপ বরফে যা হয় না একটা স্যালামান্ডার অনায়াসে তা করে ফেলতে পারে। সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেই নিবে যেতে পারে আগুন। স্যালামান্ডার আগুন-খেকোও বটে। মোটর গাড়ির পুরানো ব্যাটারি যেমন দোকানে পাঠিয়ে আবার চার্জ করিয়ে আনা হয়, স্যালামান্ডারও তেমনই আগুনে ডুব দিয়ে নিজেকে আবার কিছুদিনের মতো চাঙ্গা করে নিয়ে আসে।



আগুনে পোড়ে না
স্যালামান্ডার
ফ্রাঙ্কফুর্ট, ১৬৮৭

তাছাড়া দরকার বোধ করলে আগুনে নিজের জামা কাপড়ও সে পালটে আসে। অনেক সময় নাকি দেখা গেছে আগুন থেকে বেরিয়ে আসার পর স্যালামান্ডারের গায়ে আনকোরা নতুন চামড়া!

স্যালামান্ডারের ছেড়ে-যাওয়া চামড়ার জন্য একসময় সারা দুনিয়ায় সে কী কাড়াকাড়ি! খনিতে অ্যাসবেসটাস পাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত লোকেদের বিশ্বাস ছিল এ নিশ্চয় স্যালামান্ডারের চামড়া, কিংবা জমাট থুথু। নয়তো অ্যাসবেসটাস

আগুনে পোড়ে না কেন? একসময় ভারতের এক সম্রাটের নাকি একটা আজব কোট ছিল যা আগুনে পুড়ত না। একশ' স্যালামান্ডারের চামড়া জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল সেটি। তাই শুনে রোমের এক পোপও নাকি একটি আলখাল্লা করিয়েছিলেন স্যালামান্ডারের চামড়া দিয়ে। তিনি সেটি পরিষ্কার করাতেন আগুনে। এমনই নানা গল্প স্যালামান্ডারকে নিয়ে।

স্যালামান্ডার যেমন শান্ত শীতল তেমনই আবার বিষাক্ত। সে যদি কোনও গাছের গায়ে কিছুক্ষণ জড়িয়ে থাকে তবে সে গাছের ফুল ফল পাতা সব বিষিয়ে যায়। কোনও নদীতে নামলে বিষাক্ত হয়ে যায় গোটা নদীর জল। আলেকজান্ডারের চার হাজার সৈন্য আর দু হাজার ঘোড়া নাকি ভারতে এসে মারা পড়েছিল আচমকা কোনও লড়াইয়ে নামবার আগেই। ওরা এমন একটি নদীর জল পান করেছিল যেখানে স্নান করেছিল এক স্যালামান্ডার! কার ক্ষমতা বেশি? বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডারের, না আমাদের এই ছোট্ট স্যালামান্ডারের?

এখন অবশ্য এই আগুন-খেকো বীরের আর দেখা মেলে না। স্যালামান্ডার এখনও আছে বটে, কিন্তু সে নিতান্তই টিকটিকি জাতীয় একটি নির্দোষ প্রাণী। ঠাণ্ডা মেজাজ, ঠাণ্ডা শরীর। ছায়াশীতল স্যাঁতসেঁতে জায়গায় তার বাস। পোকামাকড় খেয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকে সে। আগুনের ধারেকাছেও যায় না। কে বলবে, এই স্যালামান্ডারকে নিয়েই এমন সব আজব গল্প ফাঁদা হয়েছিল একদিন।

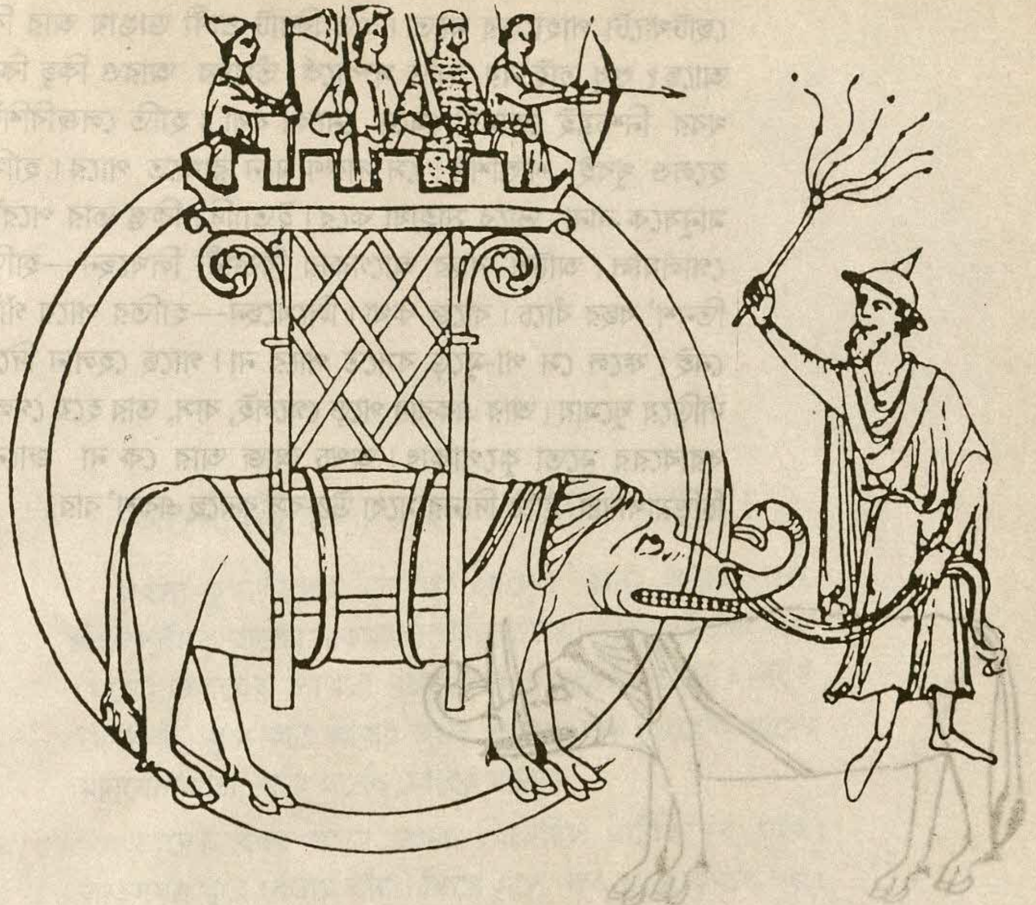


স্যালামান্ডার
১৫৭৯ সালে আঁকা

হাতি নাকি বসতে পারে না!

যদি বলি এটা হাতি, তাহলে তোমরা হয়তো মানতে চাইবে না। সার্কাসে কিংবা চিড়িয়াখানায় হাতি যারা দেখেছ তারা তো একে হাতি বলে মেনে নিতে রাজী হবেই না, নিজের চোখে যারা এখনও জ্যান্ত হাতি দেখনি তারাও না। সত্যি বলতে কি, বইয়ের পাতায় ছাপা ছবির হাতিও দেখতে অন্যরকম। আরও গোলগাল নাদুস-নুদুস, পাগুলো তার থামের মতো, কান দুটো কুলোর মতো। এ হাতির দাঁতগুলো মুলোর মতো হলেও অনেক কিছুই বেঢপ বেঠিক। তবু হ্যাঁ এটা হাতি বইকি।

এ হাতির ছবি যিনি এঁকেছেন তাঁকে অবশ্য এদের দলে ফেলা ঠিক হবে না। তিনি অন্ধ তো ননই, বরং বলা যায় যাদের চোখ আছে তাঁদের চেয়েও অনেক বেশি জোরালো তাঁর দেখবার ক্ষমতা। এ হাতি এঁকেছেন তিনি একদম হাতি চোখে না দেখে, শুধু শোনা কথার ওপর ভর করে। এবং এঁকেছেন হালে নয়, আজ থেকে প্রায় আটশ' বছর আগে। তবু দেখো, লেজে কিংবা পায়ে, পেটে কিংবা মুখে গোলমাল ঘটালেও তিনি মাহুতের একটা ব্যবস্থা করেছেন। মাহুত অবশ্য এখানে হাতির চেয়ে অনেক উঁচু,—তবু নাকে দড়ি বেঁধে হাতিকে ঘোরাতে পারে যে সে মাহুত বই কি! হাতির পিঠে হাওদায় বসে লোকেরা কিভাবে যুদ্ধ করতে পারে



এটা নাকি হাতির ছবি!

তাও দেখিয়েছেন তিনি। এধরনের হাওদা হয় কি না সেটা অবশ্য অন্য কথা।

আগেই বলেছি, যেমন শুনেছেন, ছবি-আঁকিয়ে ঠিক তেমনটিই আঁকবার চেষ্টা করেছেন। ছবিতে হাতির যদি মানহানি হয়ে থাকে তবে দোষ তাঁর নয়, হাতির বিবরণ যাঁরা শুনিয়েছেন তাঁদেরই। সেকালের ইউরোপে হাতি দেখেছেন এমন লোক প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে আমাদের চেনাজানা হাতি সম্পর্কে তাঁদের পুঁথিপত্রে নানা আজগুবি খবর। এ-ছবিটি যে রোমান পুঁথি থেকে তুলে দেওয়া হলো তাতে লেখা আছে—হাতি পর্বতের মতো। গ্রিকরা একে 'এলিফ্যান্ট' বলে, কারণ গ্রিক ভাষায় 'এলিফিও' মানে পর্বত। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। পর্বত না হলেও হাতি নিশ্চয়ই

ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। এত বিরাট প্রাণী ডাঙায় আর কি আছে? শুধু তাই নয়, হাতি সম্পর্কে তাঁদের আরও কিছু কিছু খবর নিশ্চয়ই তোমরা মেনে নেবে। যথা ঃ হাতি লেজবিশিষ্ট হলেও খুবই শান্তশিষ্ট। সে দারুণ মনে রাখতে পারে। হাতি মানুষকে নানা ভাবে সাহায্য করে। ইত্যাদি। কিন্তু তার পরেই গোলমাল। আটশ' বছর আগেকার বিজ্ঞানী লিখছেন—হাতি তিনশ' বছর বাঁচে। বাজে কথা। লিখেছেন—হাতির পায়ে গাঁট নেই। ফলে সে পা-মুড়ে বসতে পারে না। গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। আর একবার পড়ে গেলেই, ব্যস, তার হয়ে গেল। বরাবরের মতো কুপোকাৎ। অথচ আজ আর কে না জানে, চিড়িয়াখানার হাতি দিনের মধ্যে উঠ-বস করছে একশ' বার।



অনেকেই দেখেছেন মৎস্যকন্যাদের !

মৎস্য-কুমারীদের কে না চেনে? তারা সাগর-তলে প্রবালপুরীতে থাকে। সাতমহলা বাড়ি তাদের। তারা ঢেউয়ের সঙ্গে খেলে। জলঘেরা পাথরে বসে রোদ্দুরে চুল শুকোয়। মানুষ দেখলেই ঝুপ করে আবার জলে পালিয়ে যায়। অর্ধেক তাদের মানুষের মতো, বাকি অর্ধেক, মাছের মতো।

তাদের খবর প্রথম শোনা গিয়েছিল নাবিকদের মুখে। সাতসমুদ্র ঘুরে বেড়ায় তারা। ফিরে এসে কত রাজ্যের কত গল্প। জলের নানান খবর। শোনা গেল, জলে শুধু হাতিঘোড়া নয়, দেবতা এবং মানুষও আছে। ডাঙায় যেমন নানা ধরনের মানুষ, জলেও তেমনি। রাজা, প্রজা, পাদরী—সবাই রয়েছেন। এদের মধ্যে দেখবার মতো মৎস্য-কুমারীরা। ফুটফুটে চেহারা। ডাগর ডাগর চোখ। মাথা-ভরতি সোনালি চুল। তবে কী জানো, মৎস্য-কুমারীরা বড্ড দুষ্টু। ওরা নাবিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

মৎস্য-কুমারীদের এক বোন সাইরেন। আদ্যিকালে সাইরেনদের যারা নিজের চোখে দেখেছে, তারা সবাই একবাক্যে বলে, সাইরেনরা ঠিক মৎস্য-কুমারীদের মতো নয়। অর্ধেক তাদের যদি মানুষের মতো, তবে কোমর থেকে নীচের দিকে পাখির





১৮শতকে আঁকা

মতো। পরে শোনা গেল, এসব নাকি চোখের ভুল। এই জল-কন্যারাও মৎস্য-কন্যাদেরই মতো। পাখির কথা মনে করিয়ে দেয় তারা গলার সুরে। সাইরেনরা এমন মিষ্টি সুরে গান গায় যে, তার তুলনা নেই। গান গেয়ে ওরা নাবিকদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর তাদের মেরে ফেলে। গ্রিক বীর ইউলিসিস তা-ই তাঁর জাহাজের নাবিকদের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর একজন অরফিউস, নিজেই এমন গান জুড়লেন যে, সাইরেনদের আর চালাকি খাটলো না। অরফিউসের গলার কাছে কোথায় লাগে তাদের গান। লজ্জায় তারা সেদিন জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। পরীর মতো মেয়েরা নিমেষে কয় খন্ড পাথর হয়ে গেল।

শুধু নাবিক কেন, অন্যেরাও নিজেদের চোখে দেখেছেন মৎস্য-কন্যাদের। তবে দু'চার মাসের মধ্যে নয়, শত শত বছর আগে। মানুষের হাতে ধরা পড়ার পর একজন নাকি তাঁত চালাতে শিখেছিল। আর-একজন নাকি প্রতি রোববার চার্চে যেত। হতে পারে এসব গুজব। তবে গল্পের বইয়ের পাতায় যে-সব মৎস্য-কন্যা আর জলপরীর দল, তাদের কিন্তু গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পুরী কিংবা দীঘায় বেড়াতে গিয়ে আজ আর যদি মাঝ-সমুদ্রে মৎস্য-কন্যাদের দেখা না যায়, সে দোষ কিন্তু ওদের নয়, মানুষেরই। মানুষই এখন মাছের মতো। জলের তলায় সে ডুবুরী। ডুবোজাহাজ নিয়ে চতুর্দিকে তার দৌড়াদৌড়ি। সমুদ্র তোলপাড়। কোথায় থাকবে বেচারা মৎস্য-কুমারী? বাধ্য হয়েই হয়তো তারা আজ মনের দুঃখে পালিয়ে গেছে বনে।

একশো মাথা শুধু হাইড্রার নয়

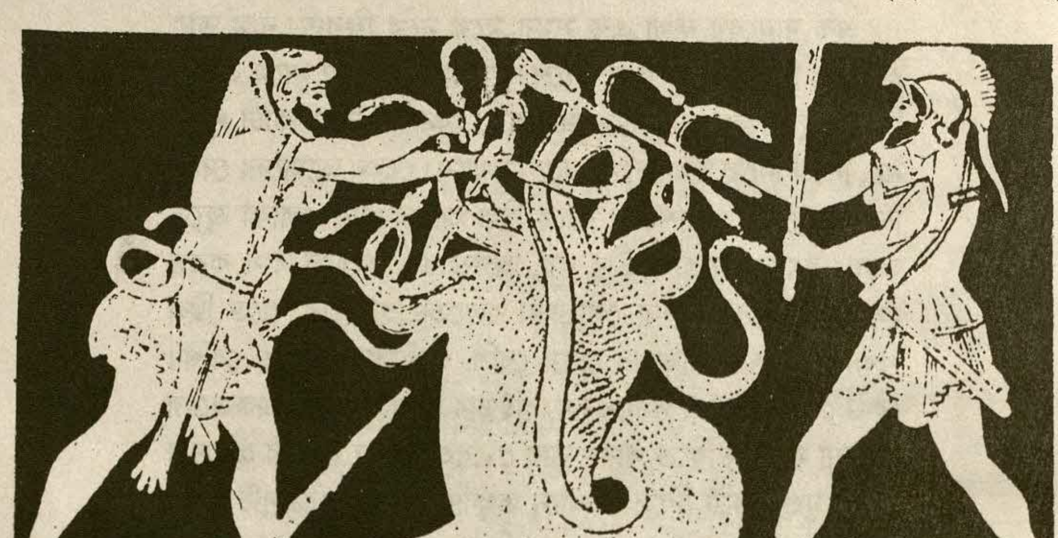
আমরা মানুষ। আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে একটা করে মুণ্ডু। কিন্তু কারও কারও রয়েছে অনেক মুণ্ডু বা, মাথা। রাবণের দশটি মাথা। সেদিন একটা ছবিতে দেখলাম গণেশ ঠাকুরের একুশটি মাথা। রাবণকে কেউ নিজের চোখে দেখেননি। গণেশ ঠাকুরকেও না। সবই মানুষের কল্পনা।

এক দানবের কথা এক সময় মুখে মুখে ফিরত। নাম তার হাইড্রা। ঠিকানা দূর গ্রিস দেশে। সেখানে লেরনা নামে একটি বিশাল হ্রদ ছিল। হ্রদ মানে জলাশয়। কোদাল দিয়ে কাটা পুকুর নয়, নিজে নিজে জল জমে আছে সেখানে। যেমন আমাদের দেশে চিল্কায়। সেই জলাশয়ের কাছে ছিল অনেকখানি এলাকা জুড়ে জলা। হ্রদের মতো গভীর নয়, অগভীর। হাইড্রা বাস করত সেখানে। গ্রিস দেশের লোকেরা বলতেন হাইড্রার ঘাড়ে ছিল পঞ্চাশটি মাথা। রাবণের চেয়ে বেশি, গণেশের চেয়েও বেশি। কেউ কেউ বলতেন পঞ্চাশ নয়, হাইড্রার মাথা একশো। একজনের একশো মাথা, ভাবতে পার? তার চেয়েও ভয়ের ব্যাপার হাইড্রার একটা মুণ্ডু কেটে দিলে সেখানে তক্ষুণি গজিয়ে ওঠে দুটি মুণ্ডু। একের জায়গায় দুই? আরও মুশকিল এই মাঝখানে যে মুণ্ডুটি সেটি অমর। তার মৃত্যু নেই। কিছুতেই তাকে কাটা যায় না। আর,

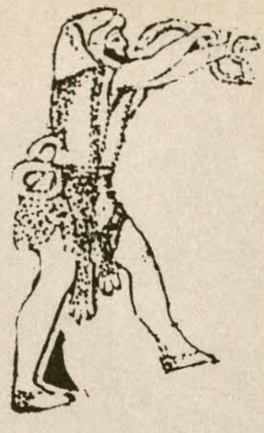
কাটবেই বা কেমন করে? হাইড্রার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ। সে যেখানে থাকে সেখানের জল, বিষ-জল। সে যদি কোনও ফসলের ক্ষেতে নিঃশ্বাস ফেলে তবে মাঠ বাদামি রং হয়ে যায়। তার মানে ক্ষেত নষ্ট। হাইড্রা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখনও তার চারপাশ ঘিরে থাকে বিষাক্ত বাতাস।

গ্রিস দেশে তখন এক মস্ত বীর ছিলেন। নাম তার হারকিউলিস। চারদিকে তার নামডাক। তিনি দায়িত্ব নিলেন অমর হাইড্রাকে হার মানাবার। হারকিউলিস এক সঙ্গীকে নিয়ে একদিন যাত্রা করলেন সেই জলার দিকে, যেখানে রয়েছে হাইড্রা। হাইড্রার এক মুণ্ডু কেটে দিলে তক্ষুনি যে সেখানে দুটি মুণ্ডু গজিয়ে ওঠে, হারকিউলিসের তা জানা ছিল। তিনি সঙ্গীর হাতে তুলে দিলেন জ্বলন্ত লোহা। বললেন, আমি তলোয়ারের ঘায়ে যখনই একটি মুণ্ডু কেটে ফেলব তক্ষুণি এই টকটকে লাল লোহার ফলকটি তুমি চেপে ধরবে সেই রক্তাক্ত ঘাড়ে। তাহলেই দেখবে, তাহলে আর নতুন মুণ্ডু গজাবে না। এমনি করে হারকিউলিস একে একে হাইড্রার নিরানব্বইটি মাথা কেটে ফেললেন। বাকি রইল একটি মাত্র। সেই মাঝখানে যেটি, সেটি। সে মাথার মৃত্যু নেই, তবু

গ্রিক-পাত্রে আঁকা হাইড্রা ও হারকিউলিসের যুদ্ধ



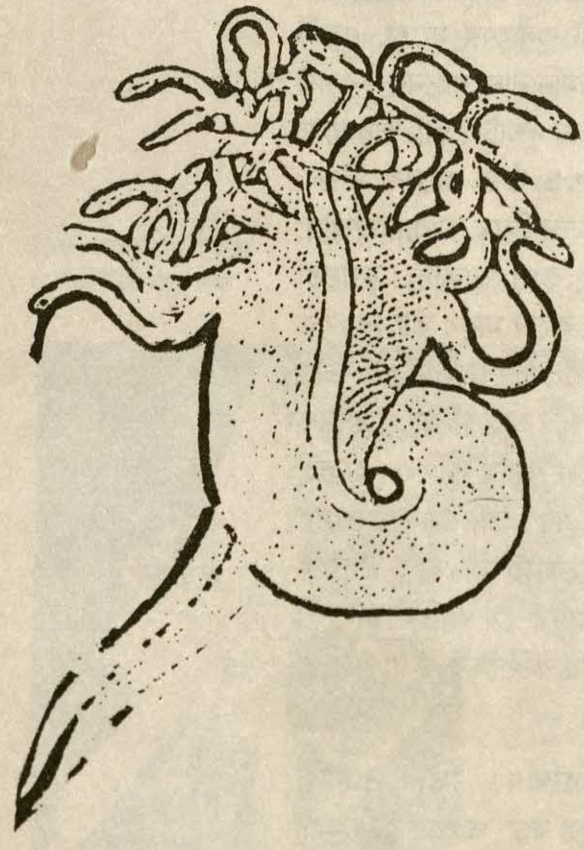
তাকে মারতেই হবে। হারকিউলিস বিশাল এক খণ্ড পাথর এনে হাইড্রার মাথায় ফেলে দিলেন। তারপর সেই পাথরেই চাপা দিয়ে রাখলেন হাইড্রার মাথাটি। লোকে বলে এখনও নাকি সেই অমর মাথা পাথর চাপাই পড়ে আছে সেখানে। হাইড্রা এখনও স্বপ্ন দেখে একদিন সে প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কোথায় পাবে হারকিউলিসকে?



একশো মাথা কিন্তু শুধু হাইড্রার নয়, আরও একজনের ছিল। সে ছিল চীন দেশের বাসিন্দা। অনেক, অনেককাল আগের কথা। একদিন জেলেদের জালে কি যেন একটা বিশাল প্রাণী ধরা পড়ল। জেলেরা দিন ভর পরিশ্রম করে জালটি ডাঙায় তুলল। আজব ব্যাপার। যা ধরা পড়েছে তা মাছ বটে কিন্তু আবার ঠিক মাছও নয়। তার একটি মাথা বাঁদরের মতো, একটি কুকুরের মতো, একটি ঘোড়ার মতো, একটি শূয়োরের মতো। এমনি নানা ধরনের একশটি মাথা। বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দৃশ্যটা। হ্যাঁ, আমাদের দেশের সেই গৌতম বুদ্ধ। চীন দেশেও তাঁর অনেক ভক্ত। সেখানেও ভক্তরা বিশ্বাস করেন, মানুষ মরে গিয়ে আবার জন্মায়, যাঁরা খুব ভালো কাজ করেন তাঁদের কথা আলাদা। নয়তো জন্মাতেই হবে। বিশেষত, যে-সব মানুষ বাজে মানুষ তাঁদের। বুদ্ধ একশো রকমারি মুণ্ডুধারী মাছটিকে দেখলেন। জেলেরা তো ভয়ে কাঁপছে। বুদ্ধ কিন্তু মোটেই ভয় পেলেন না। শান্ত গলায় মাছটিকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি কপিল? হ্যাঁ, আমি কপিল। বলেই মাছটি মরে গেল। বুদ্ধ তখন জেলেদের এবং তার অন্য ভক্তদের বললেন, এই কপিল কে ছিল, আর কেনই বা তার এরকম একশো মুণ্ডু নিয়ে জন্মাতে হল, তোমাদের সে কাহিনী বলছি। তোমরা মন দিয়ে শোন। বলেই বুদ্ধদেব কপিলের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শোনার মতো গল্প।

কপিল ছিলেন একজন খুব গুণী ব্রাহ্মণ। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্র ছিল তাঁর মুখস্থ। এত বড় পন্ডিত বুঝি আর হয় না। কিন্তু সন্ন্যাসী হলেও কপিল ছিলেন খুব বদ্‌মেজাজী।

ভীষণ রাগ তাঁর। তাঁর ছাত্ররা তাঁর কথা ঠিক মতো না বুঝতে পারলে খুবই রেগে যেতেন তিনি। বলতেন, গর্দভ কোথাকার। কাউকে বলতেন শুয়োর। কাউকে বোকা শেয়াল। কাউকে বা হাবা ঘোড়া। কোনও মাস্টার মশায়ের পক্ষে ছাত্রদের এভাবে গালমন্দ করা মোটেই ঠিক নয়। বুদ্ধ বললেন, সন্ন্যাসী হয়েও সন্ন্যাসীর মতো ব্যবহার করেননি কপিল। পন্ডিত হয়েও পন্ডিতের মতো স্বভাব ছিল না তাঁর। ফলে এই দশা। কপিল হাতেনাতে তার ফল পেয়েছেন। নিজের স্বভাবের জন্য তিনি মানুষ না হয়ে সমুদ্রের মাছ হয়ে জন্মেছেন, এবং ছাত্রদের যা যা বলে গাল দিতেন সেসব জন্তুর মাথাগুলোই তাঁর ঘাড়ে বসেছে। বলে বুদ্ধ গল্প শেষ করলেন।



জলে দৈত্যের মতো ভেসে ওঠে

নাম তার —নেসি। নিবাস—লক্‌স নেস। লক্‌স নেস স্কটল্যান্ডের একটি হ্রদ। লম্বায় চব্বিশ মাইল, চওড়ায়—এক থেকে দু মাইল। গভীরতা—সাতশো ফুট। কোথাও কিছু বেশি, কোথাও কম। এই হ্রদেই বাস করে নেসি। শত শত বছর ধরে লক্‌স নেস-ই তার ঠিকানা। এখনও।

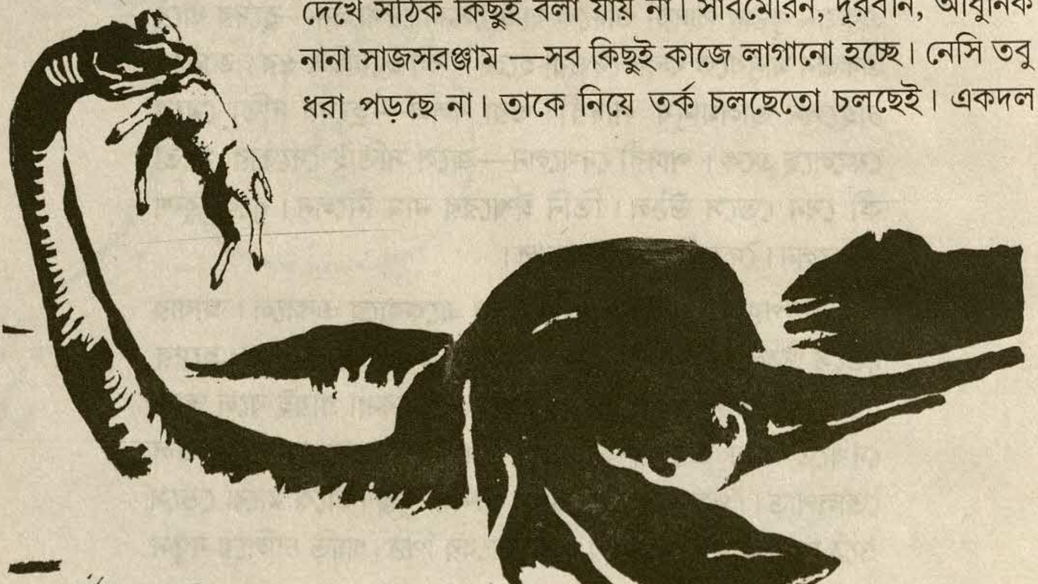
প্রথম তার কথা শোনা গিয়েছিল অনেক শো বছর আগে। একজন খৃষ্টান পাদরী ওদিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন—হ্রদের ধারে একজন মানুষকে কবর দেওয়া হচ্ছে—কী হয়েছিল ওর? জানতে চাইলেন ভালমানুষ পাদরী। ওরা বলল—হ্রদের দত্যি মেরে ফেলেছে একে। পাদরী দেখলেন—জলে সত্যিই দৈত্যের মতো কী যেন ভেসে উঠল। তিনি ঈশ্বরের নাম নিলেন। বুকে ক্রুশ আঁকলেন। দৈত্যটি পালিয়ে গেল।

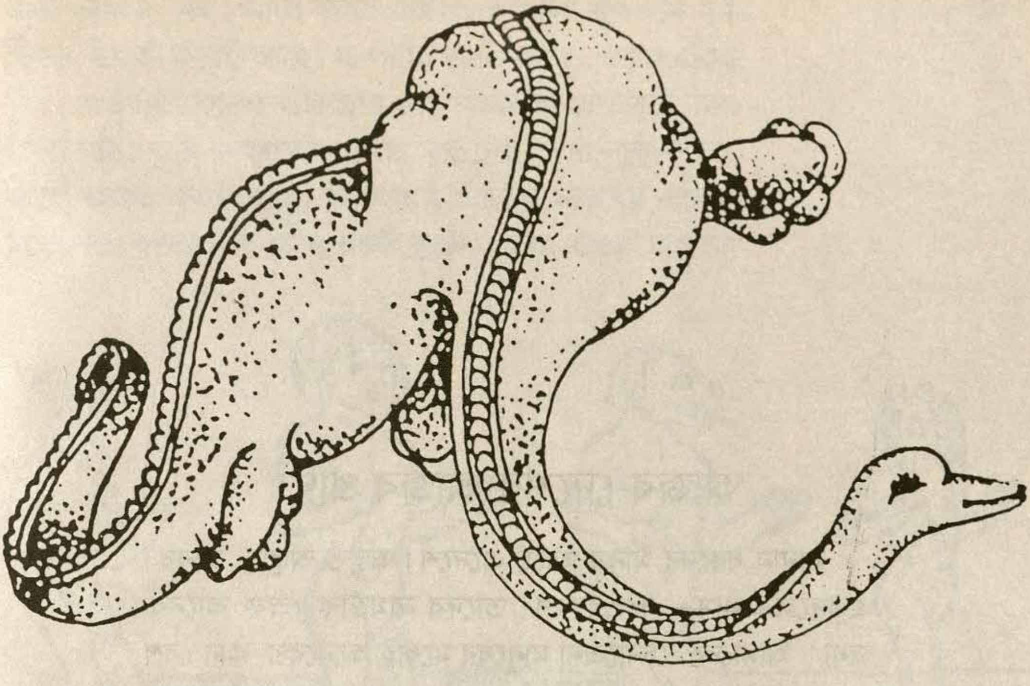
তারপর বহুকাল চুপচাপ থেকে একেবারে একালে। আবার ভেসে উঠল সেই দৈত্য। জলদানো। ১৯৩৩ সনের কথা। হ্রদের ধার ঘেঁষে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল তখন। শ্রমিকেরা প্রায়ই বলে তারা দেখতে পায় জলের তলায় কে যেন সাঁতার কাটছে। জল তোলপাড়। পেছনে 'ভি' আকারে ফেনার পুঞ্জ। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দুটো কুঁজ। বোধ হয় জলদানবের পিঠ। গাড়ি চালিয়ে নতুন

রাস্তা ধরে যেতে যেতে একদিন মিস্টার আর মিসেস ম্যাকে দেখলেন, জলের দত্যি ডাঙায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনও প্রাণী। বিশাল চেহারা তার। মানুষের সাড়া পেয়েই পালিয়ে গেল জলে। কেউ ধরতে পারছেনা নেসিকে। ১৯৩৪ সনের জুলাইয়ে কুড়িজনের একটি দল গড়া হয়েছিল হ্রদের ওপর নজর রাখার জন্য। সকাল নটা থেকে বিকেল দুটো পর্যন্ত তাঁরা ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে থাকতেন হ্রদের ধারে এখানে ওখানে। দৈত্যটা যদি কখনও ভেসে ওঠে সেই আশায়। খান কয় ছবিও তাঁরা তুলেছিলেন। কিন্তু ধোপে টিকল না। বিজ্ঞানীরা নেড়ে চেড়ে বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

বিশ্বাসীরা তবু অটল। তাঁরা মাঝেমাঝেই নাকি লক্‌স নেস-এর সেই জলজন্তুটিকে দেখতে পান। ১৯৬০ সন থেকে টিম ডিনসডেল নামে এক সাহেব তো সব কাজকর্ম ছেড়ে ওই দৈত্য নিয়েই আছেন। টি-ভিতেও একবার ছবি দেখালেন নেসির। ছবি অস্পষ্ট। কিন্তু তাই নিয়ে চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা· আর আলোড়ন। '৬৪ সনে জলের ওপর মঞ্চ গড়ে ক্যামেরা খাটানো হল। নেসির স্পষ্ট ছবি চাই। সেবারও ছবি উঠল ভাসাভাসা। ছবি দেখে সঠিক কিছুই বলা যায় না। সাবমেরিন, দূরবীন, আধুনিক নানা সাজসরঞ্জাম —সব কিছুই কাজে লাগানো হচ্ছে। নেসি তবু ধরা পড়ছে না। তাকে নিয়ে তর্ক চলছেতো চলছেই। একদল

লক্‌স নেস হ্রদে
জলদানো নেসি





বলেন, দূর এসব বাজে কথা আসলে দৈত্য নেই। অন্য দল বলেন আলবাত আছে!

যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন প্রাণী

আজব চিড়িয়াখানার আজব প্রাণীরা বুঝি বা এভাবেই জন্মায়। জন্মাচ্ছে এখনও। আমাদের কাছাকাছি আর-এক নমুনা তার—ইয়েতি। তার বাস—হিমালয়ে। শেরপারা নাকি অনেকেই দেখেছে তাকে। সাত থেকে সাড়ে সাত ফুট উঁচু। সারা গায়ে লম্বা বাদামি চুল। ডিমের আকারের মাথা, ওপরের দিকটা সরু। গোরিলার মতো মুখ। সাধারণত মানুষের মতো চলে দু'পায়ে ভর দিয়ে ইত্যাদি। এ ভারেস্টে চড়তে গিয়ে অভিযাত্রীরা বরফে তার পায়ের ছাপ দেখেছেন। এরিক শিপটন ছবিও তুলে এনেছিলেন সেই ছাপের। কিন্তু কত চেষ্টাই না করা হলো, ইয়েতি তবু ধরা পড়ল কই! হিলারি মিছিমিছি হয়রান হলেন—ইয়েতি খুঁজতে গিয়ে। তাই বলে কি বলা যায়, নেসি মিথ্যা,—মিথ্যা ইয়েতি? না। কারণ, বনের বাঘের মতোই সত্য মনের বাঘ। কল্পনাতেও অবশ্যই মজা আছে একটা।

আজব দেশের আজব প্রাণী

নানান ধরনের মানুষ আছে এদেশে। অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ। একদলেন নাম—কর্ণপ্রাবরণ। তাদের নামডাক স্রেফ কানের জন্য। আমাদের চেনাজেনা মানুষের মধ্যেই অনেকের কান বেশ বড়। তাই বলে কি আর কুলোর মত? তা নয়। একটু-আধটু বড়, এই যা। তবু না হয় তাদের বলা গেল—লম্বকর্ণ। কিংবা—মহাকর্ণ। কিন্তু কর্ণপ্রাবরণদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা চলেনা তাদের। এমনকি হাতির কানও হার মানে তাদের কানের কাছে। কর্ণপ্রাবরণদের কান নেমে এসেছে একেবারে পা অবধি। আমরা কান পেতে শুনি, ওরা কান পেতে ঘুমোয়।

আর একদল একাক্ষু। তাদের কান এমন কিছু নয়, অনেকটা কুকুরের মতো। দেখবার জিনিস চোখখানা। কপালের ঠিক মধ্যিখানে একখানা চোখ। মাথা ভর্তি খাড়াখাড়া চুল। বুক ভর্তি লোম। একাক্ষুদের মতো রয়েছে আবার একপাদ। একখানা মাত্র পা সম্বল। তাই নিয়ে সে কী ছোটাছুটি। দৌড়ে ঘোড়াও হার মানে তাদের কাছে। আর এক দলের পা আবার উদ্ভট। নাম দেওয়া যায় উল্টোচরণ। আমাদের পায়ের আঙুল সামনের দিকে। ওদের পায়ে আঙুল পেছনের দিকে। সামনের দিকে গোড়ালি। ওরা হাঁটে কিন্তু আমাদেরই মতো, হন হন সামনের দিকে।

এদেশে আর একদল মানুষ আছে যাদের নাক নেই। নেই মানে একদম নেই। আছে বলতে প্রকাণ্ড একখানা মুখ। সে মুখ দিন-রাত্তির হাঁ করেই আছে। যা পাচ্ছে তা-ই খাচ্ছে। ওরা সবকিছু খায়। খাওয়ার কোনও বাছবিচার নেই। এমনকি চেটেপুটে আম পর্যন্ত খায়! আর একদলের আবার মুখ নেই। তার নাক-সর্বস্ব। আছে বলতে একটি নাক। তাও আর পাঁচজন মানুষের নাকের মতো নয়। ওদের নাক মানে একটি ফুটো। এদের খাওয়া দাওয়ার



আজব মানুষ
১৪৭৮ সালে
আঁকা থেকে

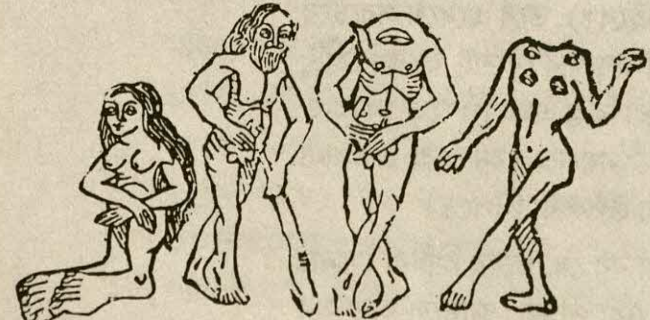
ভারি কষ্ট। ওরা গন্ধ খেয়ে বেঁচে থাকে। পোড়া মাংসের গন্ধ, তাজা ফুলের গন্ধ, পাকা ফলের গন্ধ। দুর্গন্ধ ওরা একদম সইতে পারেনা। এজন্য সৈন্যদের তাঁবুতে মোটে থাকতে চায় না। (তাহলে কি কলকাতায় থাকতে চাইবে?) তবে এদেশে সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস পিঁপড়ে। পিঁপড়ে সব দেশেই থাকে। ছোট, বড় মাঝারি—নানা ধরনের পিঁপড়ে। কিন্তু এমন পিঁপড়ে কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। পিঁপড়ে নয়তো যেন এক একখানা শেয়াল। ইয়া ইয়া চেহারা। ওরা খুব উপকারী পিঁপড়ে।

ওরা সোনা খুঁড়ে আনে। এজন্য নয় যে, ওদের গিন্নিরা সোনার গয়না পরে, কিংবা সোনার নামে ওরা পাগল। আসলে আর সব

পিঁপড়ের মতো এদেরও অভ্যাস মাটি খোঁড়া। বড় বড় পিঁপড়ে তো, তাই খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক নিচে চলে যায়। আর মুখে করে নিয়ে আসে মাটির সঙ্গে সোনা। এদেশের মানুষ ওদের গর্ত থেকেই সোনা পায়। রাশি রাশি সোনা।

যে দেশে এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ আর পিঁপড়ে ছিল সে দেশটির নাম কি জান? শুনলে অবাক হয়ে যাবে—সে আমাদেরই এই ভারতবর্ষ। দুহাজার বছরেরও আগে দূরের গ্রিস দেশ থেকে আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছিলেন একজন। নাম তাঁর মেগাস্থেনিস। এসব খবর রয়েছে তাঁর লেখা বিবরণে। ছোটরা তো পড়ে অবাক। তারা বেশ মজা পেল। বুড়োরা অনেক সময় খুঁতখুঁতে হয়। তাঁরা ভ্রূ কোঁচকালেন। একজন চেপে ধরলেন লেখককে। এসব তুমি নিজের চোখে দেখেছ? মেগাস্থেনিস বললেন—তা কী করে হয়? ওরা সব বনে থাকে। একবার রাজা চন্দ্রগুপ্ত তাদের ধরে আনতে বলেছিলেন। ওরা এমন কান্নাকাটি জুড়লে যে শেষপর্যন্ত আর আনা গেল না। কেউ কেউ নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিল। রাজা বললেন—তবে থাক। একবার শুধু সেই দলের দু'একজনকে আনা হয়েছিল যাদের মুখ নেই। তারা বেশ শান্ত ছিল।

আর সেই পিঁপড়ে? মেগাস্থেনিস বললেন—তার কথা কে না শুনেছে? আমরা ঠিক ওই পিঁপড়ে দেখিনি। তবে তাদের চামড়া দেখেছি। লোকেরা প্রায়ই নিয়ে আসত আমাদের শিবিরে। দেখবার মতো চামড়া !



ভ্যাম্পায়ার দেখতে নানারকম

টকটকে লাল ঠোঁট। পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা ধারালো দাঁত। জ্বলজ্বলে চোখ। চোখে সম্মোহনি দৃষ্টি। হাতে লম্বা লম্বা ধারালো নখ। লোমশ জোড়া ভুরু। হাতের চেটোতে ঘন চুল। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। ওরা রক্ত খায়। ওদের একমাত্র খাদ্য রক্ত। ওরা রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার।

স্বদেশের ভ্যাম্পায়ার যে দেখতে একরকম তেমন নয়, ইউরোপের কোথাও কোথাও মাথায় তার লম্বা লাল চুল। ওল্টানো ঠোঁট চলে গেছে নাকের কাছাকাছি। বুলগেরিয়ায় আবার নাক বলতে দুটি নয় একটি ফুটো। বাভেরিয়ায় আবার ওরা ঘুমোয় চোখ খোলা রেখে। আমেরিকায় বাস যাদের তারা রক্তচোষে নাকদিয়ে, কান থেকে। মেক্সিকোয় ওদের চেহারা বুঝিবা আরও ভয়াবহ, সেখানে ভ্যাম্পায়ারের মাথায় চুল নেই, মাস নেই, শুধুই করোটি। তুলনায় চীনের ভ্যাম্পায়াররা বুঝিবা একটু নরম ধাতুর। ওরা শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে নাকি চাঁদের আলো থেকে!

ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপে নানা কাহিনী শোনা যায় ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে। গ্রিক, রোমান, হিবরু পুরাকাহিনীতেও খুঁজে পাওয়া যায় ওদের। তবে আধুনিক দুনিয়ার ভ্যাম্পায়ার অধ্যুষিত



অঞ্চল বলতে প্রধানত পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল। সেখানকার মানুষেরা ভেবেই পাননা ওরা জীবিত কোন প্রাণী, না মৃত। না জ্যান্ত, না মরা, তার মাঝামাঝি অস্তিত্ব ওদের। ওরা বাস করে গোপন কোনও অন্ধকার আশ্রয়ে, প্রধানত কবরে। রাত্রে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে শিকারের সন্ধানে। শিকার বলতে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের শবের দিকেই ওদের ঝোঁক। অসাধু অধার্মিক মানুষ যাঁরা মারা যান, মৃত্যুলোকে তাদের প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে না। এই মৃতের দল নিজের দেহকে আশ্রয় করেই কবরে কবরে বেঁচে থাকে। ভ্যাম্পায়ার যাদের রক্ত চুষে খায় অন্তে তারাও পরিণত হয় রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারে। এ ভাবেই বেড়ে চলে তাদের সংখ্যা। আর দিকে দিকে পল্লবিত হতে থাকে তাদের নিয়ে নানা কাহিনী। কেউ কেউ বলেন ভ্যাম্পায়ার যেমন ইচ্ছা তেমন চেহারা ধারণ করতে পারে। ইচ্ছে করলে বাদুড় হতে পারে। ইচ্ছে করলে নেকড়ে হতে পারে। রাত্রে তামাম প্রাণীকূল তাদের অধিকারে। ভ্যাম্পায়ার রাত্রির অধীশ্ব। হ্যাঁ, ভ্যাম্পায়ার জ্যান্ত মানুষকেও আক্রমণ করতে পারে বইকি। বলা নিষ্প্রয়োজন, মৃতের মতো ভ্যাম্পায়ারের জীবিত শিকারও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। সেও নতুন শিকারের সন্ধানে অন্ধকারে জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ১৭২৭ সালের কথা, সার্বিয়ার এক কৃষক আর্নল্ড পাওলে তার ঘোড়ার গাড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা যায়। যথারীতি তাকে কবর দেওয়া হয়। গাঁয়ের লোকেরা বলে পাওলে রাত্রে তার প্রতিবেশীদের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন আর তিনি যে বাড়িতে উঁকি দিচ্ছেন, সে বাড়িতেই কান্নার রোল উঠছে, কেউ না কেউ মারা যাচ্ছেন। অনেক শলাপরামর্শ করে অবশেষে তার কবর খোঁড়া হল। দেখা গেল শব অবিকৃত এবং তার শরীরে যে কাপড়খানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সেটি রক্তাক্ত, সুতরাং কারো আর সন্দেহ রইল না যে পাওলে মরেও মরেননি, তিনি ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছেন। কী করে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? ভেবেচিন্তে স্থির হল—শব পুড়িয়ে ফেলাই সঙ্গত। তার চিতার ভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হল চারদিকে। সেইথেকে নাকি ওই



ভয়ঙ্কর প্রাণী ভ্যাম্পায়ার

গ্রাম ভ্যাম্পায়ারের উৎপাত থেকে মুক্ত।

ভ্যাম্পায়ারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরও কিছু কিছু কৌশল আছে। রোমানিয়ার লোকেরা ভাবতেন শনিবার ভ্যাম্পায়ারের শরীরে কোন জোর থাকে না। সেদিন তাকে মেরে ফেলা খুবই সহজ। দেখতে হবে কবরের কাছে কোনও গর্ত আছে কিনা, যদি থাকে তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ওই কবরে ভ্যাম্পায়ার আছে। সুতরাং একবালতি গরম জল ঢেলে দিলেই কেল্লাফতে। অবশ্য দিনের বেলা কবরে ঘুমন্ত অবস্থায় তার কলজে বরাবর বর্শা চালিয়ে দিয়েও তাকে খতম করা যেতে পারে। তবে মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে মুণ্ডুটা কেটে ফেলাই প্রশস্ত। কাটামুণ্ডুর মুখে যদি রসুন গুঁজে দেওয়া যায় তবে সে ভ্যাম্পায়ারের আর প্রাণ ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ভ্যাম্পায়ার সূর্যের আলো মোটে সইতে পারে না।

একবার যদি সে সূর্যের দিকে তাকায় তবে তার বিনাশ অবধারিত। সম্ভবত সে কারণেই ভ্যাম্পায়ারের ছায়া নেই। আয়নাতেও তার মুখ দেখা যায় না।



তৎকালে তবু যে সব মানুষ ভ্যাম্পায়ারের খোরাক হয়ে যায়নি তার কারণ ভ্যাম্পায়ার ক্রুশ, লোহা এবং রসুনকে যমের মতো ভয় পেত। অনেকেই নাকি রাত্রে পুঁতির মালার মতো রসুনের মালা পরে ঘুমোতে যেতেন। আমাদের দেশে তৎকালে ক্রুশ ছিল না অবশ্য, কিন্তু অভাব ছিল না রসুনের। সম্ভবত সেকালে এদেশে ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশেষ শোনা যায়নি।

এই রক্তচোষা প্রাণীটিকে নিয়ে ইউরোপে অষ্টাদশ শতক থেকে কত কাহিনীই না রচিত হয়েছে। ১৮০০ সালে ইউরোপের দর্শক রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র এই প্রাণীটিকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আলেকজান্ডার দুমার মতো লেখকেরা ভ্যাম্পায়ার নিয়ে গল্প লেখেন। ১৮৪৭ সালে ব্রিটেনে প্রকাশিত হয় ভার্নে দ ভ্যাম্পায়ার অফ্ দ্যা ফিষ্ট অফ ব্লাড নামে জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। তার পঞ্চাশ বছর পরে স্যার নেহরি আরবি শুরু করেন নতুন এক কল্পকাহিনী—'ড্রাকুলা', ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো, কিং কং-এর মতো একালের মানুষের সৃষ্ট নতুন আর এক প্রাণী। ড্রাকুলা নিয়ে অন্তত একডজন চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে আধুনিক কালে।

প্রশ্ন হল ভ্যাম্পায়ার বা ড্রাকুলা কি পুরোপুরি কাল্পনিক? প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বলেন রক্তপায়ী একজাতীয় বাদুড় সত্যই রয়েছে পৃথিবীতে। ওরা লাজুক, লেজহীন। ওদের মুখে রয়েছে ধারালো দাঁত। নিঃশব্দে, মুহূর্তের মধ্যে শিকারের গায়ে তা ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত বের করতে পারে। তারপর জিভ দিয়ে চেটে সে রক্ত মুছে নেয়। উপকথার ভ্যাম্পায়ারের নামে ওদের নামকরণ করা হয়েছে 'ভ্যাম্পায়ার ব্যাট'। ছোট্ট ওই রক্তচোষা বাদুড়ই কি পরিণত হয়েছিল উপকথার ভ্যাম্পায়ারে? তবে গবেষকেরা বলেন ড্রাকুলার মতো হিংস্র দুর্ধর্ষ চরিত্রের মানুষও নাকি ছিল একজন মধ্যযুগে, ইউরোপে। প্যানসিলভেনিয়ার সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারীর নাম 'ভালদ দ ইম্পেলার'। জীবিত মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে তিলে তিলে হত্যা করত সেই দুর্বৃত্ত। চারদিকের মানুষ নাম দিয়েছিল ওঁকে—ড্রাকুলা, মানে-শয়তান-নন্দন।

অচিনদেশের অচিন পাখি

'এমন সময় এক কাণ্ড হয়েছে। সেই দেশে এক সর্বনেশে চিল থাকত। সে গরু, মহিষ, হাতি ঘোড়া, যা পেত তাই ধরে গিলত। খালি সেই মেছুনীর কাছে সে জব্দ ছিল। মেছুনীর ঝুড়ি ধরতে এলেই মেছুনী তাকে এমন বকুনি দিত যে সে পালাবার পথ পেত না। কিন্তু তাতে তার রাগ আরও বেড়ে যেত, আর সে, ভাবত যে, যেমন করেই হোক একদিন ঐ ঝুড়িটা কেড়ে নিতে হবে।'

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর এই মেছুনী আর চিল অনেকেরই চেনাজানা। গল্পের নাম—'পিপঁড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর।' আনমনা মেছুনীকে ফাঁকি নিয়ে চিল সেদিন সত্যি সত্যি ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল তার মাথার ঝুড়ি। তারপর—

'সেই দেশের রাজার মেয়ে ছাতে বসেছিলেন। দাসী তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। রাজার মেয়ে আকাশের দিকে দেখছেন, এমন সময় তাঁর চোখে কী যেন পড়ল। রাজার মেয়ে চোখ বুঁজে বললেন,—দাসী দেখ দেখ, আমার চোখে কী পড়েছে! দাসী কাপড়ের কোণ পাকিয়ে, তাতে থুথু লাগিয়ে তাই দিয়ে রাজকন্যার



রক পাখি বা গ্রিফিন
জার্মানি, ১২৩৭

চোখের ভিতর থেকে ভারি চমৎকার একটা ছোট্ট কালো জিনিস বার করলে।'

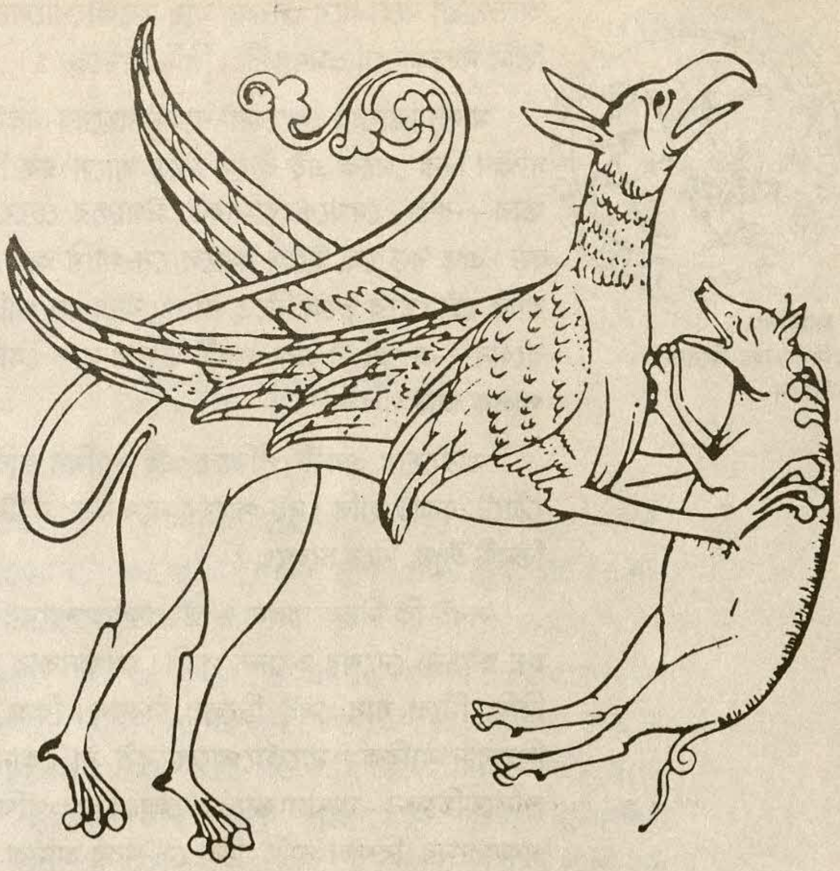
'টুনটুনির বই'-এর পড়ুয়ারা জানে সে জিনিসটি আসলে একটা ঝুড়ি। তার ভিতরে কতকগুলি মাছ আছে, আর কজন লোক কুস্তি লড়ছে।

চিল মেছুনীর মাথা থেকে ওই ঝুড়ি নিয়েই পালিয়ে ছিল। যে দেশে মেছুনীর ঝুড়িতে দু'জন পালোয়ান লড়াই করতে পারে, বামুনের চাকর মরা হাতি পুটলিতে বেঁধে লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে দিব্যি পথ চলতে পারে, মানুষসুদ্ধ ঝুড়ি সে দেশের রাজকন্যার চোখে কুটো বলে মনে হতে পারে, সে-দেশে এমন 'সর্বনেশে চিল' ও থাকতে পারে, বইকি! মনে নেই, ওই চিলের পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে সাতশো মোষ ট্যাঁকে গুঁজে ছুটে পালিয়েছিল গোয়ালা?

এ চিল অচেনা দেশের অচিন পাখি।

আমাদের চেনাজানা পৃথিবীতেও নাকি একদিন ছিল এমনই সব পাখি। সিন্ধবাদ নাবিকের নিজের চোখে দেখা সেই পাখিটিকে মনে পড়ে? তাঁর দ্বিতীয় বারের সমুদ্র যাত্রায় একটি দ্বীপে নেমেছেন সিন্ধবাদ। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল বিশাল একটি গম্বুজ। মসৃন। ধবধবে শাদা। তার চারপাশ ঘিরে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন সিন্ধবাদ—জিনিসটি ঠিক কী। কিন্তু কোথাও কোনও দরজা খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন মসৃন যে, ওপরে ওঠার চেষ্টা বৃথা। সিন্ধবাদ একটা জায়গায় দাগ কাটলেন। তারপর শুরু করলেন গম্বুজ পরিক্রমা। ঘুরে এসে তিনি মনে মনে হিসাব করলেন—তাঁকে ঘুরতে হয়েছে পঞ্চাশ পা। পা মানে, পদক্ষেপ।

বিস্ময় বিমূঢ় সিন্ধবাদ যখন বস্তুটি নিয়ে ভাবছেন তখন হঠাৎ আকাশে বিশাল একখণ্ড মেঘের আবির্ভাব। সূর্য ঢেকে গেল। আর, তারপর সেই মেঘ নেমে এল মাটিতে। সিন্ধবাদ দেখলেন তিনি একটি বিরাট পাখির ছায়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে তিনি নিজেকে বেঁধে ফেললেন পাখির পায়ের সঙ্গে। ঘাসের



মতো পা। পাখি বুঝতেও পারল না তার পা জড়িয়ে রয়েছেন একজন দুঃসাহসীক মানুষ।

রক পাখি কি কোনদিন ছিল?

সিন্ধবাদকে নিয়ে সে পাখি নামল একটি পাহাড়ের চুড়ায়। সে তখনও জানে না তার পা জড়িয়ে রয়েছে মানুষ। সিন্ধবাদ বলছেন—এ পাখির খাদ্য রাশি রাশি সাপ। এত সাপ সে খেতে পারে যে, একটা আস্ত হাতি খেয়ে ফেলাও শক্ত নয়।

সিন্ধবাদ নাবিকের উপাখ্যানে এ-পাখির নাম—রুক। কেউ কেউ বলেন—রক। সেই যে শাদা গম্বুজটি তিনি দেখেছিলেন সেটি আসলে সে পাখিরই ডিম। রক পাখির ডিম।

এ-পাখি কি সত্যিই কোনদিন ছিল এই পৃথিবীতে? আলবৎ ছিল, বলবেন মার্কোপোলো। সিন্ধবাদকে যদি বা কাল্পনিক



জার্মানিতে
সিলমোহর হিসেবে
গ্রিফিন

অভিযাত্রী বলে ধরে নেওয়া যায় মার্কোপোলোকে অবশ্যই নয়। তিনি সত্যকারের ভ্রমণকারী। তিনি লিখছেন ঃ

মাদাগাস্কারের লোকেরা বলেন বছরের একটা বিশেষ মরশুমে দক্ষিণ দিক থেকে এই দ্বীপে উড়ে আসে এক বিশাল পাখি। নাম তার—রুক। দেখতে অনেকটা ঈগলের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। এত বড় যে, ইচ্ছে করলে সে-পাখি অনায়াসে একটা আস্ত হাতি ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে। যাঁরা সে-পাখি দেখেছেন তাঁরা বলেন—এ পাখির এক একটি ডানার মাপ ষোলপা। এক একটা পালক আট পা!

পারস্যের একটি পুঁথিতে এই পাখির ছবিও রয়েছে। তার ঠোঁটে একটি হাতি। দুই পায়ের নখে আর দু'টি। যেন বাজপাখি তিনটি ইঁদুর নিয়ে চলেছে !

সবই কি নিছক কল্পনা? উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের পাখি না-হয় অচেনা দেশের অচেনা পাখি। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে দিব্যি মিলে যায় সেই চিলের বিবরণ। কিন্তু কী দেখেছিলেন সিন্ধবাদ নাবিক? মার্কোপোলোকেই বা কোন্ পাখির কাহিনী শুনিয়েছিলেন মাদাগাস্কারের লোকেরা। পৃথিবীর আদ্যিকালে একধরনের বিশাল পাখি ছিল সে-খবর আমরা জানি। সে পাখির নাম—ARCHAEOPTERYX। সে সব প্রায় পনেরো কোটি বছর আগেকার কথা। দশ কোটি বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল আর এক পাখি—CHTHYORNIS। তারপর এল নতুন পাখি—DIATRYMA। ওরা নাকি ছিল সাড়ে ছয় ফুট উঁচু। স্পষ্টতই সিন্ধবাদ কিংবা মার্কোপোলো এসব পাখির কথা বলেন নি। কেননা, ওঁরা কেউ কোটি কোটি বছর আগেকার মানুষ নন। তবে কি ওঁরা বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন অ্যালবাট্রস নামে সেই সুন্দর পাখিটির দিকে। অ্যালবাট্রস, ওঁদের মাপে বিশাল কোন পাখি হয়তো নয়। মেললে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ওদের ডানা। বড়জোর বার মিটারের মতো। হতে পারে ওঁরা কোনও বিশাল ঈগল কিংবা শকুন দেখেছিলেন। হতে পারে ওঁরা কোনও মেঘখণ্ডকেই কল্পনা করেছিলেন বিশাল পাখি বলে!

সূর্যের পাখি ফিনিক্স

সে এক আশ্চর্য পাখি।

লাল আর সোনালি মিলিয়ে তার ডানা। ওড়ে যখন, রামধনুকের ছটা তার পাখায়। এমন সুন্দর পাখি বুঝি আর হয় না। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বলতে পারো, সুন্দর তো ময়ূরও। অবশ্যই। একশোবার। সত্যি বলতে কী সব পাখিই সুন্দর। তবু এর সঙ্গে তুলনা চলে না কারও। কেন জানো? আর সব পাখি একদিন না একদিন মরে, কিন্তু এ-পাখি মরে না কোনদিন। হাজার বছর পরে যদি বা একবার মরে, পরক্ষণেই বেঁচে ওঠে আবার। এই সেই বিখ্যাত পাখি নাম যার—ফিনিক্স।

আদ্যিকালের গ্রিস দেশের ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরে এসে শুনেছিলেন ফিনিক্সের গল্প। তিনি লিখেছেন, আমি এসব বিশ্বাস করি না। তিনি অবিশ্বাস করলে কী হবে, ফিনিক্সের কাহিনী গ্রিস, রোম—সর্বত্র সকলের মুখে মুখে। ফিনিক্স যেন সব দেশেরই মনের মতো পাখি। কারণ, ফিনিক্স মৃত্যুহীন। সে অমর পাখি। ইউরোপের অতি চালাক বদ্যিরা এক সময় ওষুধের সঙ্গে নাকি মিশিয়ে দিত ফিনিক্সের বাসার খড়কুটো আর ছাই। রোগীদের বলত—খেয়ে দেখ, ফিনিক্সের মতোই বেঁচে থাকবে চিরকাল।

এক গল্পে শোনা যায়, ফিনিক্স বাস করে স্বর্গের বাগানে। হাজার বছর পরে সে যখন বুঝতে পারে শরীর জবুথবু হয়ে



মৃত্যুহীন পাখি — ফিনিক্স

এসেছে, তখন সে স্বর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ে ডানা মেলে সূর্যের পিছু পিছু পশ্চিম দিকে। কারণ, স্বর্গে সবাই অমর। সেখানে চুপচাপ বসে থাকলে চিরকাল বুড়ো হয়েই কাটাতে হবে। পশ্চিমে আরব মুলুক হয়ে শেষ পর্যন্ত সে বাসা বাঁধে মিশরে এক সূর্য মন্দিরে। সূর্যের তাপে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তার বাসা। বুড়ো ফিনিক্স ছাই হয়ে যায় সেই আগুনে। তারপর সেই ছাই থেকে আবার পাখা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে নতুন ফিনিক্স। আবার সে উড়ে যায় সূর্যের দিকে—স্বর্গলোকে। ফিনিক্স সূর্যের পাখি।

ফিনিক্সের মৃত্যু এবং তারপরেই বেঁচে-ওঠা নিয়ে অন্য গল্পও আছে। তবে সব গল্পের কথাই এক, আগুনে পুড়ে গেলেও এ-পাখি মরে না। কী পুবে, কী পশ্চিমে, এ-পাখিকে যে-নামেই ডাকা হোক না কেন, সে অমর। আসলে ফিনিক্স পাখি মাত্র নয়, মানুষের আত্মার প্রতীক নাকি। মানুষ মরে যায়। কিন্তু মৃত্যুতেই কি সব শেষ? ফিনিক্স বলে না, তা হবে কেন? দেখছ না, আমি কেমন ছাই থেকে উঠে এলাম !

